বিঃ ৩২৫

পৌরাণিক গল্প

(প্রথম ভাগ)

[ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুল সমূহের জন্য প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত]

[কলিকাতা গেজেট, ২৩শে মে, ১৯৪০]

কুলদারঞ্জন রায়

মূল্য ১৲ টাকা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্‌স্ লিমিটেড্

স্বত্বাধিকারী—**আশুতোষ লাইব্রেরী**

৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

চিত্রশিল্পী

ফণী গুপ্ত

দশম সংস্করণ

১৩৬২

মুদ্রাকর

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনারসিংহ প্রেস

৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

উপহার

সূচীপত্র
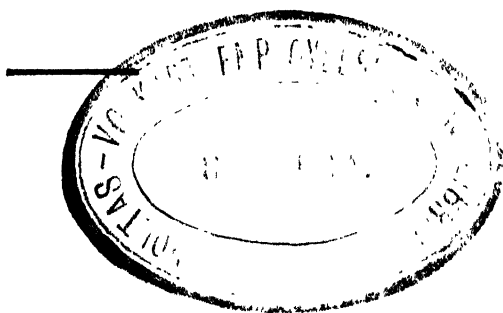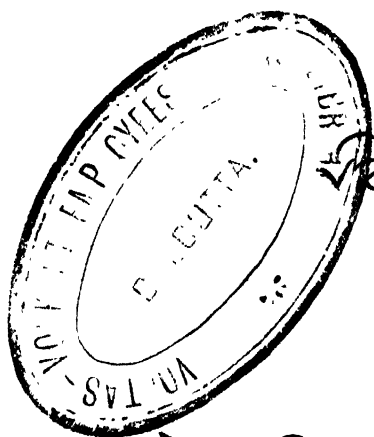
পৌরাণিক গল্প

(প্রথম ভাগ)

জড়ভরত

পুরাকালে শালগ্রাম নগরে পরম হরিভক্ত এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ভরত। তিনি মহানদীর তীরে আশ্রম বানাইয়া একমনে হরিপূজা করিতেন। একদিন এক হরিণী তাঁহার আশ্রমের নিকটে জলপান করিতে করিতে, হঠাৎ বনের মধ্যে সিংহগর্জ্জন শুনিয়া, ভয়ে লাফাইতে গিয়া নদীর উঁচু পাড় হইতে পড়িয়া গেল। ভরত দেখিলেন, হরিণী মাটিতে পড়িবামাত্র প্রাণ হারাইল এবং তাহার ছানাটি নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

দয়ালু ভরত অসহায় হরিণ-শিশুকে জল হইতে উঠাইয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন এবং তাহাকে কোলে করিয়া আশ্রমে লইয়া আসিলেন।

রাজা ভরতের যত্নে হরিণ-শাবক দিন দিন বড় হইতে লাগিল। ক্রমে ছানাটির উপর রাজার এমন মায়া জন্মিয়া গেল যে, সাধন-ভজন পূজা-আচারের উপর আর তাঁহার মন রহিল না, তিনি হরিণের চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন। বনে চরিতে চরিতে যদি কোনদিন তাহার বাড়ী ফিরিতে দেরি হইত, তবে ভরতের ভাবনার আর সীমা থাকিত না; ভাবিতেন—'হায়! হায়! বাছাকে বুঝি সিংহ কিংবা বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে!'

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং রাজ্য ছাড়িয়া তিনি যে সাধনার জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন, ক্রমে তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। কালক্রমে, এই পুত্রতুল্য হরিণটিকে দেখিতে দেখিতে ভরত দেহত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুর সময়েও তিনি যে কেবল হরিণের চিন্তাই করিয়াছিলেন, সেজন্য মৃত্যুর পরে তিনি কালঞ্জর পর্ব্বতে হরিণরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কথা তাঁহার মনে জাগিয়া রহিল। সেজন্য মাতাপিতাকে

ছাড়িয়া তিনি সেই শালগ্রামেই ফিরিয়া আসেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেই পূর্ব্বজন্মের আশ্রমের নিকটেই বাস করেন।

ইহার পর তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম লইলেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণেরা যাহা করে, সে সকল কাজে তাঁহার শ্রদ্ধা হইল না,—বেদ শাস্ত্র পুরাণ কিছুই তিনি পড়িতেন না! কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জড়ের ন্যায় অস্পষ্ট উত্তর দিতেন এবং তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। অতি সামান্য যে দুই-একটি কথা বলিতেন, তাহাতেও ভাষা এবং ব্যাকরণের ভুল থাকিত। মোট-কথা, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও তিনি অব্রাহ্মণের মত হইলেন! তাহার উপর আবার তাঁহার কাপড়-চোপড় ময়লা এবং সমস্ত শরীর অযত্নে নোংরা ও কাদামাখা হইয়া থাকিত। এরূপ অবস্থায় গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে দেখিলেই যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর অপমান করিবে সেটা আর বিচিত্র কি? বাস্তবিক সকলে তাঁহাকে পাগল বলিয়াই মনে করিত।

ক্রমে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাকে অতি সামান্য রকম খাদ্য দিয়া, তাঁহার দ্বারা

চাষবাসের কাজ করাইতে লাগিল। তিনিও যেন পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ ভাবেই বিনা আপত্তিতে সব কাজ করিতেন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, সেই গ্রামের লোকদের যখন যে কাজ পড়িত, তাঁহাকে শুধু দুই মুঠা খাইতে দিয়াই সে কাজ করাইয়া লইত।

একদিন সৌবীররাজ পাল্কী চড়িয়া কপিলমুনির আশ্রমে যাইতে চাহিলেন। 'দুঃখপূর্ণ সংসারে মানুষ কি ভাবে জীবন কাটাইবে'—ইহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই রাজা মহর্ষি কপিলের নিকট যাইতেছিলেন। রাজার লোকেরা অন্য পাল্কী-বেহারাদের সঙ্গে এই ব্রাহ্মণরূপী ভরতকেও ধরিয়া আনিয়াছিল। ভরতের পূর্ব্বজন্মের কথা সমস্তই মনে ছিল, সেজন্য পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তিনি পাল্কী বহিতে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না।

অনভ্যাসবশতঃ পাল্কী কাঁধে লইয়া ব্রাহ্মণ একটু ধীরে ধীরে চলিলেন। কিন্তু অন্য বাহকগণ দ্রুত চলিতেছে, সেজন্য পাল্কীতে একটা ঝাঁকানির মত উঠিয়া গেল। রাজা সৌবীর বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আঃ তোরা সকলে সমানভাবে চল্ না, বড় ঝাঁকানি লাগিতেছে যে!"

রাজার কথা শুনিয়া অন্য বাহকগণ সেই ব্রাহ্মণকে
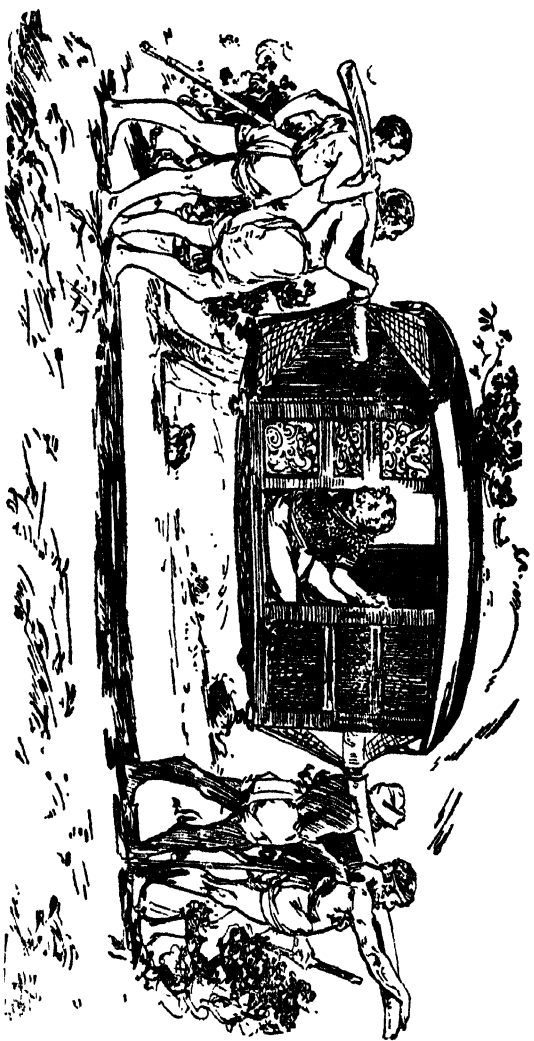
"আঃ তোরা সকলে সমানভাবে চল্ না।"

দেখাইয়া বলিল—"মহারাজ! এই ব্যক্তি অলসভাবে চলিতেছে বলিয়াই পাল্কীতে ঝাঁকানি উঠিয়াছে।"

তখন রাজা সৌবীর ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"ওহে! তুমি ত বেশী পথ শিবিকা বহন কর নাই, তবে এত শীঘ্র ক্লান্ত হইলে কেন? তোমার শরীর ত বেশ হৃষ্টপুষ্ট, তবে পরিশ্রম করিতে পার না কেন?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন—"মহারাজ! আমি শিবিকা বহন করিতেছি, একথা মিথ্যা। এই যাহা দেখিতেছেন, তাহা আমার শরীর মাত্র; আমার পা দুইটি মাটির উপর দাঁড়াইয়াছে, পায়ের উপর যথাক্রমে পেট, বুক, হাত ও কাঁধ রহিয়াছে, আর সেই কাঁধের উপরে পাল্কী। তাহা হইলে, আমি পাল্কী বহন করিতেছি—একথা কি মিথ্যা হইল না? পঞ্চভূতের শরীর—তুমি, আমি এবং অন্য সমস্ত জীবকেই পঞ্চভূতে বহন করিতেছে! গাছপালা, বাড়ীঘর, পাহাড়-পর্ব্বত সমস্তই পঞ্চভূতের ব্যাপার। সুতরাং, যদি বল আমার উপর পাল্কীর ভার রহিয়াছে, তবে একথাও বলিতে পার যে, অন্য সমস্ত প্রাণিগণের উপরও শুধু শিবিকা নয়—সমস্ত পৃথিবীর ভারটা চাপান রহিয়াছে।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ নীরব হইলেন। তখন রাজা সৌবীর পাল্কী হইতে নামিয়া সেই ব্রাহ্মণের পদতলে পড়িয়া বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণ! আপনি যে ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি আমার প্রতি সদয় হউন। 'দুঃখপূর্ণ সংসারে মানুষের কর্ত্তব্য কি' ইহা জানিবার জন্যই কপিলমুনির আশ্রমে যাইতেছিলাম। এখন আর সেখানে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই—আপনি দয়া করিয়া আমাকে উপদেশ দিন্।"

তখন সেই ব্রাহ্মণ রাজার নিকট তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, মানুষের কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের লুপ্তশক্তি ফিরিয়া আসিল, তাঁহার দিব্য জ্ঞান জাগ্রত হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সকল জড়তা পরিত্যাগ করিয়া, তিনি সকলের সম্মুখেই পরম মুক্তিলাভ করিলেন।

পুরাকল্পীয় রামায়ণ

(পদ্মপুরাণ)

রাবণবধের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে রামচন্দ্র রাজা হইলেন। একদিন তিনি সভায় বসিয়া আছেন এমন সময় ব্রহ্মানন্দন মহামুনি বশিষ্ঠদেব, শম্ভু নামে একজন মুনির সহিত রাজসভায় আসিয়া রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাবণ-যুদ্ধের বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময় শম্ভুমুনি দুই-একটি বিপরীত ঘটনা—অর্থাৎ রাম রাবণকে বধ করিবার পর কুম্ভকর্ণকে বধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিপরীত কথা বলিলেন। ইহাতে রামচন্দ্র একটু বিরক্তি প্রকাশ করায় জাম্ববান্ বলিল—"প্রভু! শম্ভুমুনি যাহা বলিলেন তাহা পুরাকল্পের রামায়ণের কথা। সেজন্য আপনার ঘটনার সহিত মিলিতেছে না। আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখে ঐ রামায়ণ যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি :—

সুমনা নামে অতি প্রসিদ্ধ এক নগর ছিল। সেই নগরের রাজা ছিলেন সাধ্য। সাধ্য বড় ক্ষমতাবান্ রাজা

ছিলেন। অযোধ্যার রাজা দশরথ সুমনা নগর জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া, শত অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত যাত্রা করিলেন। সাধ্যের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল। একমাস যাবৎ যুদ্ধ করিয়া দশরথ সাধ্যকে পরাস্ত করিলেন। তখন সাধ্যপুত্র ভূষণ আসিয়া দশরথের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ভূষণ রূপে, গুণে ও পরাক্রমে সত্যই পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ ছিল। তাহাকে দেখিয়াই দশরথের মনে বাৎসল্য-ভাব জাগিয়া উঠিল, তিনি আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন—আহা! এমন সুন্দর বালকের শরীরে আমি কিরূপে অস্ত্রের আঘাত করিব? আমারও ত ঠিক এইরূপ সুন্দর একটি পুত্র ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাছা আমার ভল্লুকের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে। এই বালককে দেখিয়া আমার সেই পুত্রের কথা মনে পড়িতেছে।

রাজা দশরথের মনে এইরূপে দয়ার আবির্ভাব হওয়াতে, তিনি ভূষণের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া, তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন এবং সাধ্যের বাড়ীতে বন্ধুভাবে একমাস বাস করিলেন। ভূষণকে যতই দেখেন ততই যেন দশরথের মনে পুত্রমুখ দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হয়।

"এই বালককে দেখিয়া পুত্রের কথা মনে পড়িতেছে।"

অবশেষে একদিন তিনি সাধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল দেখি, কি করিয়া তোমার ভূষণের মত পুত্র লাভ করিতে পারি ?'

সাধ্য বলিলেন—'মহারাজ! আপনি বিষ্ণুর পূজা করুন। তিনি তুষ্ট হইলে আপনাকে আমার ভূষণের মত পরম সুন্দর ও গুণবান্ পুত্র দিবেন।'

রাজা দশরথ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া, সাধ্যের পরামর্শমত বিষ্ণুর উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে, বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া দশরথকে দেখা দিয়া বলিলেন—'আমি তোমার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন বর প্রার্থনা কর।'

দশরথ বলিলেন—'প্রভু! দয়া করিয়া আমাকে চারিটি পুত্র দান করুন।'

এই সংবাদ পাইয়া দশরথের চারি রাণী—কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুরূপা আর সুবেশা—যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কৌশল্যা বলিলেন—'এই দেবতা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ইনিই আমার পুত্ররূপে জন্ম লউন।'

বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলিয়া যজ্ঞীয় পায়সে প্রবেশ করিলেন।

দশরথ সেই পায়সকে চারিভাগ করিয়া রাণীদিগকে খাইতে দিলেন। ক্রমে রাজার চারিটি পুত্র জন্মিল— কৌশল্যার পুত্র রাম, সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ, সুরূপার পুত্র ভরত, আর সুবেশার পুত্র শত্রুঘ্ন। ক্রমে শিশুরা বড় হইয়া উঠিল। মহামুনি বশিষ্ঠদেব তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইলেন, যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন। দেখিতে দেখিতে সকলেই পৃথিবীর সকল রকম বিদ্যায় নিপুণ হইল।

পুত্রদিগের বিবাহের জন্য কন্যা সন্ধান করিতে দশরথ নানা দেশের রাজাদিগের নিকট দূত পাঠাইলেন। কিছু-দিন পরে এক দূত ফিরিয়া আসিয়া দশরথকে বলিল— 'মহারাজ! বিদর্ভদেশের রাজা বিদেহের এক কন্যা আছে, সেটিকে তিনি যজ্ঞ করিয়া পাইয়াছেন; তেমন সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা আর নাই। এই কন্যাই আপনার রামের উপযুক্ত।'

এই সংবাদ শুনিয়া দশরথ মহামুনি বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে সেখানে পাঠাইলেন। তাঁহারা কন্যা দেখিয়া লগ্ন স্থির করিয়া রাজাকে সংবাদ দিলে পর, রাজা দশরথও মহাসমারোহে মিথিলায় উপস্থিত হইলেন।

সবই ঠিক, এমন সময়ে, বিবাহের পূর্ব্বদিন নারদমুনি মিথিলায় উপস্থিত হইয়া বিদেহরাজকে বলিলেন—'তোমার কন্যার বিবাহ ক্ষত্রিয়-বিবাহ, সুতরাং ইহা স্বয়ংবর নিয়মে হওয়া উচিত, নতুবা বড়ই দোষের কথা হইবে।'

বিদেহরাজ সে কথা রাজা দশরথকে বলিলে, তিনিও সম্মত হইলেন। তখন বিদেহরাজ দূত পাঠাইয়া নানা দেশের রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নিমন্ত্রণ করার পর তিনি ভাবিলেন—হায়, কি করিলাম! রামকে কন্যা দিব বলিয়া কথা দিয়াছি, লগ্নপত্র স্থির হইয়া গিয়াছে, এরূপ অবস্থায় আবার স্বয়ংবরের উদ্যোগ করিতে গেলাম কেন?

এই দুর্ভাবনায় বিদেহরাজের সারা রাত্রি ঘুম হইল না। তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে মহাদেবের শরণ লইলেন। মহাদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন—'তোমার কোন ভাবনা নাই, রামই সীতার স্বামী হইবে। তুমি আমার এই পিনাক ধনুটি লও। ধনুকে গুণ পরান নাই। যে ব্যক্তি ইহাতে গুণ পরাইতে পারিবে, তাহাকেই সীতা দিবে—এই প্রতিজ্ঞা কর।' এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।

পরদিন বিদেহরাজ সেই ধনুকখানি সভায় রাখাইলেন। তারপর দেবতা গন্ধর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, পৃথিবীর মান্যগণ্য বলবীর্য্যশালী রাজগণ একে একে সকলেই স্বয়ংবরক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদেহরাজ তাঁহার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিলে, প্রথমে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া ধনুকে গুণ পরাইতে বহু চেষ্টা করিয়াও ধনু বাঁকাইতে পারিলেন না। তারপর সূর্য্য আসিয়া অনেক টানাটানির পর একেবারে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। পবনদেবের শরীরে অসাধারণ শক্তি, কিন্তু তিনিও ধনুকের গুঁতা খাইয়া একেবারে চিৎপাত!

এই সময়ে অসুররাজ বাণাসুর, অনেক অসুর সঙ্গে লইয়া স্বয়ং প্রহ্লাদের সহিত সভায় আসিয়া উপস্থিত। দেবতাদিগের চেষ্টা বিফল হইলে, বাণ তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিয়া ধনুর নিকটে গেলেন; কিন্তু ধনুকে গুণ পরান দূরে থাকুক, তিনি সেটাকে মাটি হইতে দুই আঙ্গুলের বেশী তুলিতেই পারিলেন না। ইহার পর বলি, প্রহ্লাদ প্রভৃতি আরও অনেক অসুর হার মানিল!

তারপর আসিলেন ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশ্বামিত্র ছিলেন ভারী তেজস্বী। বিশ্বামিত্র ধনু লইয়া

অতি কষ্টে নোয়াইলেন, কিন্তু এক আঙ্গুলের জন্য গুণ পরাইতে পারিলেন না। বিশ্বামিত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া অন্য কোন ব্রাহ্মণ ভরসাই পাইলেন না চেষ্টা করিয়া দেখিতে। ইহার পর ক্ষত্রিয় রাজারা একে একে সকলেই পরাজয় মানিলে পর, রাম ধনুকখানিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, হাতে তুলিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া সভার সকলে ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন—'দেখ দেখ, বালকের স্পর্দ্ধা দেখ।'

রামচন্দ্র অনায়াসে ধনুতে গুণ পরাইয়া এমন ভীষণ টঙ্কার দিলেন যে, সকলের কানে তালা লাগিয়া গেল। তখন বিদেহরাজ রামকে সীতা দান করিলেন।

এ অপমান রাজাদিগের সহ্য হইল না। তাঁহারা সকলে মিলিয়া রামের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাম তাঁহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া, সীতাকে লইয়া সকলের সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। অযোধ্যায় আসিয়া দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

এদিকে ভরতের মা কেকয়রাজের কন্যা সুরূপা, রাম রাজা হইবেন শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দশরথকে বলিলেন—'আমাকে যে বর দিবে বলিয়াছিলে, সে বর

এখন দাও—রাম চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যাক্, আর ভরত রাজা হউক।'

দশরথের মত সত্যবাদী লোক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারেন না—সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম বনে যাত্রা করিলেন।

সেই রাম বনে গিয়া অনেক রাক্ষস বধ করিলেন। রামায়ণে যেরূপ সীতা হরণ প্রভৃতি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সেই রামেরও সেইরূপ ঘটিল।

তারপর রাম ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যেখানে সুগ্রীবের বাড়ী ছিল সেখানে গেলেন। সেখানে আমগাছের ডালে ধনুর্ব্বাণ ঝুলাইয়া, গাছের তলায় আশ্রয় লইলেন, সঙ্গে একমাত্র লক্ষ্মণ। সেই গাছের ডালে বসিয়া একটা বানর আম খাইতে খাইতে গান করিতেছিল। রাম সেই বানরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? কাহার লোক? তোমার নাম কি?'

বানর বলিল—'আমার নাম হনুমান, আমি সুগ্রীবের লোক।' এই বলিয়া রামকে প্রণাম করিয়া সে সুগ্রীবের নিকট গিয়া তাঁহার সংবাদ দিল।

সুগ্রীব তাড়াতাড়ি জল ও ফলমূল লইয়া রামের নিকট

গেল এবং অনেক সমাদর করিয়া তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রাম লক্ষ্মণকে দিয়া সীতাহরণ পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বলাইলেন।

সুগ্রীব বলিল—'ইতিমধ্যে রাবণ এক রমণীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি যাইবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে এইখানে এই অলঙ্কারগুলি ফেলিয়া গিয়াছেন। দেখুন দেখি, অলঙ্কারগুলি আপনার স্ত্রীর কি না?'

অলঙ্কারগুলি দেখিয়া সীতার বলিয়া চিনিতে পারিয়া, রাম অনেক কান্নাকাটি করিলেন; তারপর সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সেই রাবণ কোন্ দিকে গিয়াছে?'

সুগ্রীব বলিল—'দক্ষিণ দিকে গিয়াছে।'

অনন্তর রাম সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন; তারপর তাহার দুর্দ্দান্ত ভাই বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবের রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিলেন। ইহার পর সুগ্রীবের দলবল লইয়া সমুদ্রতীরে গিয়া, রাম বলিলেন—'লঙ্কা কোথায়? সীতা কোথায়? আর আমার শত্রু সে রাবণই বা কোথায়?'

তারপর রামের অনুমতি লইয়া হনুমান সাগর পার হইয়া লঙ্কায় গেল এবং অশোকবনের মধ্যে সীতার সন্ধান

পাইয়া, অনেক রাক্ষস মারিল; শেষে বাড়ী-ঘর পোড়াইয়া আবার রামের নিকট ফিরিয়া আসিল।

তখন সকলের মনে ভাবনা হইল, সমুদ্রলঙ্ঘন কি করিয়া করা যায়? অনেক চিন্তার পর রাম মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। রামের পূজায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব দর্শন দিয়া বলিলেন—'এই আমার পিনাক ধনু আছে; সেতুর মত করিয়া এই ধনু সমুদ্রের উপর রাখ এবং তাহার উপর দিয়া সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাও।' এই বলিয়া, স্মরণ করিবামাত্র পিনাক ধনু আসিয়া উপস্থিত হইল। উহা রামকে দিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।

রাম পিনাক ধনু লইয়া লঙ্কার দিকে সমুদ্রের উপর ফেলিলেন। ষাট পরার্দ্ধ বানর ও রাম-লক্ষ্মণ ধনুর উপর চড়িলেন এবং তাহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে পরপারে গেলেন। অতিকায় নামক এক রাক্ষস রাবণকে গিয়া এই সংবাদ দিল।

রাবণ বলিল—'ভালই হইয়াছে, আমাদের প্রচুর খাদ্য জুটিয়াছে।'

এদিকে, ক্রমে সন্ধ্যা হইলে—সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বমান্

প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধা অনেক বানরসৈন্য লইয়া, নিকটস্থ এক বাগানে গিয়া ফলমূল খাইল ; বাগান ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড করিল এবং প্রহরী-রাক্ষসদিগকে তাড়াইয়া লঙ্কার দিকে ছুটিল। লঙ্কায় গিয়া ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া, সকলকে বধ করিয়া এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল। এই সংবাদ পাইয়া রাবণ ইন্দ্রজিৎকে ডাকিয়া হুকুম করিল—'বানর-দিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দাও।'

ইন্দ্রজিৎ ভয়ানক যোদ্ধা, কত মায়ামন্ত্র জানে। সে আকাশে লুকাইয়া অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন হনুমান ও জাম্বমান্ ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে একলাফে আকাশে উঠিল এবং পর্ব্বতের চূড়া দিয়া প্রহার করিতে করিতে ইন্দ্রজিৎকে মাটিতে ফেলিল। তখন লক্ষ্মণ আসিয়া সাঙ্ঘাতিক বাণ মারিয়া তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর অতিকায় ও মহাকায় নামে দুই রাক্ষস আসিয়া অনেক বানরসৈন্য বধ করিল এবং লক্ষ্মণকে বাণাঘাতে ব্যথিত করিল। তারপর রাম ও সুগ্রীবের সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া শেষে তাহারা হনুমান ও জাম্বমানের হাতে ধরা পড়িল।

তারপর রাক্ষস দুইটাকে বাঁধিয়া রামের নিকট উপস্থিত করিলে, রাম অতিকায়কে বলিলেন—'তুমি রাবণকে গিয়া বল যে, সীতাকে ফিরাইয়া না দিলে আমি যুদ্ধ করিয়া সমস্ত রাক্ষস বধ করিব।'

অতিকায় দম্ভ করিয়া বলিল—'আপনাকে আমরা একটুও ভয় করি না। আপনি কি মনে করিয়াছেন শুধু বলে রাবণকে বধ করিবেন? তাহা কোন মতেই পারিবেন না। লঙ্কার দরজায় ঐ যে দেখিতেছেন মহাদেবের মূর্ত্তি আছে, ঐ মূর্ত্তিকে বাণ মারিয়া কাটিতে না পারিলে রাবণের মৃত্যু হইবে না। আপনি যদি একটিমাত্র বাণ মারিয়া ঐ কাঠের মূর্ত্তিকে পাঁচভাগে কাটিয়া ফেলিতে পারেন—তবে বুঝিব আপনি বাস্তবিকই বলবান্।'

দুর্ব্বুদ্ধি রাক্ষস বুঝিল না যে, রাম সামান্য মানুষ নহেন। তাহার কথা শুনিয়া রাম তখনই ধনুকে বাণ জুড়িয়া নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষস দুইটার চক্ষের সম্মুখেই রামের বাণ সেই মূর্ত্তির উপরে পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ মূর্ত্তি কাটিয়া পাঁচখণ্ড হইয়া গেল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া রাক্ষস দুইজন রামের শরণ লইয়া বলিল—'মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আমাদের

বালক পুত্রগুলিকে রক্ষা করিবেন।' রাম 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' বলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, তাহারা লঙ্কাপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর বানরেরা লঙ্কার প্রথম প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরে দ্বিতীয় প্রাচীর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিলে, রাবণ আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া রামের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল; তখন রামের সঙ্গে তাহার ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেষে রামের বাণে জর্জ্জরিত ও রক্তাক্ত হইয়া রাবণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

পরদিন বিভীষণ রাবণকে কত বুঝাইল—'সীতাকে ফিরাইয়া দিন্।' কিন্তু রাবণ কিছুতেই শুনিল না; অধিকন্তু রাগিয়া বিভীষণকে এমন অপমানিত করিল যে, সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাবণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইল। রাম তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণকে তিনি বারংবার পরাজিত করিয়াও কিছুতেই বধ করিতে না পারিয়া বিভীষণের মুখের দিকে তাকাইলেন। বিভীষণ ইঙ্গিত দ্বারা দেখাইয়া দিল কিরূপ বাণ মারিলে রাবণ মরিবে। রাম সেইরূপ বাণ মারিবামাত্র রাবণের মৃত্যু হইল।

রাবণের মৃত্যুর পর আসিল কুম্ভকর্ণ। এই দুরন্ত রাক্ষস রামকে নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে একশত অতিশয় ভীষণ বাণ মারিয়া রাম তাহাকে বধ করিলেন।

তারপর বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়া, রাম অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা সীতার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিলেন এবং রাবণের পুষ্পক রথে চড়িয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। তারপর অযোধ্যার রাজা হইয়া তিনি পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।”

কে বড় ?

(শিব-পুরাণ)

পুরাকালে এক সময়ে—বিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, গরুড় প্রভৃতি অনুচরগণ সকলেই উপস্থিত, এমন সময় পিতামহ ব্রহ্মা সেখানে আসিলেন। বিষ্ণু শুইয়াই রহিলেন, ব্রহ্মাকে দেখিয়া উঠিলেন না। ইহাতে ব্রহ্মার বড় রাগ হইল, তিনি বিষ্ণুকে বলিলেন—"আমি জগতের পিতামহ, তোমারও প্রভু। কিন্তু আমাকে দেখিয়া তুমি অভ্যর্থনা করিলে না—তুমি ত ভারি অভদ্র !"

ব্রহ্মার কথায় বিষ্ণুর রাগ হইলেও, তিনি রাগ চাপিয়া শান্তভাবে উত্তর করিলেন—"বৎস! আইস, আমার সিংহাসনে উপবেশন কর। তুমি মিছামিছি রাগ করিতেছ কেন ? আমার ত কোন অপরাধ নাই। তুমি আমার নাভি হইতে জন্মিয়াছ, সুতরাং তুমি আমার পুত্র। অতএব আমিই তোমার গুরু; তুমি আমার প্রভু—একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

তখন এই প্রভুত্ব লইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে ভীষণ বিবাদ বাধিয়া গেল। ক্রমে দুইজনে নিজ নিজ বাহন হাঁস ও গরুড়ে চড়িয়া, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মার সহায় হইলেন ব্রাহ্মণগণ, আর বিষ্ণুর সহায় হইলেন বৈষ্ণবগণ। অন্য দেবতারা কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন না—দূরে থাকিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ামাত্র বিষ্ণু রাগিয়া ব্রহ্মার বুকে সাঙ্ঘাতিক কতকগুলি বাণ মারিলেন। সেই সব বাণ বিফল করিয়া ব্রহ্মাও বিষ্ণুর বুকে আঘাত না করিয়া ছাড়িলেন না।

এইরূপে ক্ষণকাল যুদ্ধ হইলে পর, মহাক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণু ছাড়িলেন মাহেশ্বরাস্ত্র, তখন ব্রহ্মাও ছাড়িলেন বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পাশুপতাস্ত্র।

এই দুই মহাভয়ঙ্কর অস্ত্র গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশে উঠিয়া অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। দেবতাগণ মহাভীত হইয়া ভাবিলেন—'বুঝি বা প্রলয়কাল উপস্থিত! সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হইল!'

তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, দেবতাগণ কৈলাসপর্ব্বতে মহাদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেবতাগণকে দেখিয়াই মহাদেব বলিলেন—"ব্রহ্মা-বিষ্ণুর যুদ্ধের কথা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া চল। আমিও যাইতেছি—দেখি, ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে শান্ত করিতে পারি কি-না।" এই বলিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে লইয়া, অনুচরগণের সহিত যুদ্ধস্থলে গেলেন এবং গোপনে শূন্যে থাকিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

পাশুপতাস্ত্র ও মাহেশ্বরাস্ত্রের মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির হইয়া সৃষ্টি পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই দারুণ অকালপ্রলয় দেখিয়া মহাদেব আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না—হঠাৎ মহাভয়ঙ্কর এক আগুনের স্তম্ভ হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যখানে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল মহাভীষণ অস্ত্র দুইটি সেই অগ্নিস্তম্ভে পতিত হইয়া শান্ত হইল!

ব্রহ্মা বিষ্ণু এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন তাঁহাদিগের শত্রুতা দূর হইয়া গেল। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—"কি আশ্চর্য্য! এই অদ্ভুত অনলস্তম্ভ কোথা হইতে আসিল? ইহার আদি-অন্ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না কেন?

যাহা হউক, চল আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি।" এই বলিয়া বিষ্ণু বরাহরূপ ধরিয়া, স্তম্ভের মূল দেখিবার জন্য মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাতালের দিকে গেলেন। আর ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করিয়া আকাশের দিকে উড়িলেন স্তম্ভের চূড়া দেখিবার জন্য।

এদিকে বিষ্ণু পাতাল ভেদ করিতে করিতে কতদূর যে গেলেন তাহার সীমা নাই, কিন্তু তবুও অগ্নিস্তম্ভের মূল দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং নিরাশ হইয়া, তিনি যুদ্ধস্থলে ফিরিয়া আসিলেন।

হংসরূপী ব্রহ্মা আকাশে যাইতে যাইতে অনেক উপরে উঠিয়াও স্তম্ভের শেষ পাইলেন না। এমন সময় তিনি দেখিলেন—একটি কেতকীফুল চারিদিকে মধুর গন্ধ ছড়াইয়া আকাশ হইতে পড়িতেছে। ফুলকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেতক! তুমি কোথা হইতে পড়িতেছ? কে তোমাকে ধারণ করিয়াছিলেন?"

কেতকী বলিল—"হে ব্রহ্মা! আমি এই অনলস্তম্ভের মধ্য হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া পড়িতেছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত স্তম্ভের আদি দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং আপনি যে মনে করিয়াছেন, এই স্তম্ভের চূড়া দেখিবেন সে ইচ্ছা ছাড়ুন।"

বিষ্ণু···পাতালের দিকে গেলেন। আর ব্রহ্মা···
আকাশের দিকে উড়িলেন।

কেতকের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—“হাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ, আমি হাঁসের রূপ ধরিয়া এই অনলস্তম্ভের চূড়া দেখিতেই আসিয়াছি। যাহা হউক, এখন তোমাকে আমার একটি উপকার করিতে হইবে। বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলিতে হইবে যে, ‘ব্রহ্মা স্তম্ভের চূড়া দেখিয়াছেন—আমি তাহার সাক্ষী আছি’। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলে পর, কেতকীপুষ্প মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধস্থলে গেল।

যুদ্ধস্থলে গিয়া ব্রহ্মা আনন্দে হাস্য করিতে করিতে বিষণ্ণ বিষ্ণুকে বলিলেন—“তুমি ত স্তম্ভের মূল দেখিতে পাও নাই, কিন্তু আমি চূড়া দেখিয়া আসিয়াছি, এই কেতক তাহার সাক্ষী আছে।”

ইহার পর কেতকীও যখন বলিল যে, ব্রহ্মা সত্য কথাই বলিয়াছেন, তখন বিষ্ণু সে কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং বিধাতা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া, তাঁহার পূজা করিলেন।

ব্রহ্মার এই মিথ্যা ব্যবহারে মহাদেবের দারুণ ক্রোধ হইল। তিনি সেই মুহূর্ত্তে নিজের রূপে স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন—“তুমি প্রভু হইবার

ইচ্ছা করিয়াও সত্য কথা বলিয়াছ, সেজন্য আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন হইতে তীর্থে তীর্থে লোকে স্বতন্ত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তোমার পূজা করিবে।"

তারপর ব্রহ্মাকে প্রবঞ্চনার সাজা দিবার জন্য মহাদেব ভৈরব নামে এক ভয়ঙ্কর পুরুষ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বলিলেন—"এই মিথ্যাবাদী ব্রহ্মাকে খড়্গ দ্বারা উপযুক্ত সাজা দাও।"

মহাদেবের আদেশ পাইবামাত্রই ভৈরব ব্রহ্মার মিথ্যাভাষী পঞ্চম মাথাটি কাটিয়া ফেলিল। তারপর সে অন্য মাথাগুলি কাটিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু মিষ্ট কথায় মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া বলিলেন—"আপনিই ত ইঁহাকে পাঁচটি মাথা দিয়া বিধাতা করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এখন অনুগ্রহ করিয়া ইঁহার অপরাধ ক্ষমা করুন।

বিষ্ণুর অনুরোধে মহাদেব ভৈরবকে ক্ষান্ত করিয়া, ব্রহ্মাকে বলিলেন—"তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া প্রভুত্ব পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, সুতরাং এখন হইতে জগতে তোমার পূজা হইবে না।

কি সর্ব্বনাশের কথা! ব্রহ্মা পিতামহ—এত বড় দেবতা! আর লোকে তাঁহার পূজা করিবে না!

তিনি তখনই যোড়হস্তে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন।

তখন মহাদেব তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা তোমার পূজা না হইলেও আজ হইতে তুমি সমুদয় যজ্ঞের গুরু হইবে। তোমা ভিন্ন কোন যজ্ঞই পূর্ণ এবং সফল হইবে না।"

ইহার পর মহাদেব প্রবঞ্চক কেতকীকে শাপ দিলেন—"ওরে মিথ্যাবাদি! তোর স্বভাব অতিশয় জঘন্য, আমার সম্মুখ হইতে দূর হ'। আজ হইতে তোর ফুল দিয়া আমার পূজা হইবে না।"

কেতকী পুষ্প অনেক স্তুতি-মিনতি করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিল। মহাদেব বলিলেন—"কেতক! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, তোমাকে আর আমি কিছুতেই ধারণ করিতে পারিব না। যাহা হউক, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ তোমাকে ধারণ করিবেন।"

বিরাধ রাক্ষস

বিরাধ রাক্ষসের কথা তোমরা রামায়ণে পড়িয়াছ। শিব-পুরাণে বলে, বিরাধ নাকি পূর্ব্বে রাক্ষস ছিল না। কি করিয়া সে রাক্ষস হইল শুন ঃ—

গোর্কন দেশে খুব প্রসিদ্ধ একটি শিব-মন্দির ছিল। কোন সময়ে মহর্ষি নারদ এই মন্দিরে মহাদেবের পূজা করিবার জন্য গিয়াছিলেন। যাইবার সময় মন্দিরের নিকটেই পথের ধারে দেখিলেন—একটি চাঁপাফুলের গাছে রাশি রাশি সুগন্ধ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ একটা চুপ্‌ড়ি হাতে লইয়া সেখানে উপস্থিত। নারদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি চুপ্‌ড়ি হাতে করিয়া কোথায় যাইতেছ?"

ব্রাহ্মণ ফুল তুলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সে কথা গোপন করিয়া বলিল—"আমি গরীব ব্রাহ্মণ, ভিক্ষায় বাহির হইয়াছি।"

ইহার পর নারদ মন্দিরে গিয়া মহাদেবের পূজা করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। সেই সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ ফুল তুলিয়া

চুপ্‌ড়িটি ঢাকা দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে পুনরায় দেখিতে পাইয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোথায় যাইতেছ ?"

এবারেও ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলিল—"ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু কিছু না পাইয়া শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইতেছি।"

নারদের মনে সন্দেহ হইল, তখন যোগবলে সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন এবং চাঁপাগাছের নিকট গিয়া গাছকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐ ব্রাহ্মণ কতকগুলি ফুল তুলিয়াছে ? ফুল লইয়া সে কোথায় গেল।"

সেই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বেই চাঁপাগাছকে বলিয়া রাখিয়াছিল, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে আমি ফুল তুলিয়াছি কি-না, তবে তুমি সত্য কথা বলিও না। সুতরাং নারদের কথায় গাছ বলিল—"কে ব্রাহ্মণ ? তুমিই বা কে ? কোন্ ফুলের কথা বলিতেছ ?—আমি কিছুই জানিনা।"

তখন ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে নারদের বাকি রহিল না। তিনি তখনই মহাদেবের মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন—একশত একটা চাঁপাফুল দিয়া কে জানি মহাদেবের মাথায় অর্ঘ্য দিয়াছে।

সেই সময় মন্দিরে অন্য একজন সাধু ব্রাহ্মণও মহাদেবের পূজা করিতেছিলেন। তাঁহাকে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে ? শিবের মাথায় এই ফুলগুলি কে দিয়াছে ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এ ফুল দিয়া আমি পূজা করি নাই, অন্য এক ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতিদিন এইরূপ ফুল দিয়া মহাদেবের পূজা করেন এবং সেই পূজার বলে এই দেশের রাজাকে এমনই বশ করিয়াছেন যে, এই ব্রাহ্মণই এখন রাজার দানের কর্তা ; রাজা দানধ্যান যাহা কিছু করেন, সবই এই ব্রাহ্মণের কথামত। শুধু তাহাই নহে, রাজার অনুগ্রহে এই দুষ্ট ব্রাহ্মণের অত্যাচারের আর সীমা-সংখ্যা নাই।"

ইহা শুনিয়া নারদ ভাবিলেন, 'মহাদেব চাঁপাফুল অত্যন্ত ভালবাসেন। ব্রাহ্মণ এই চাঁপাফুল দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাহারই বলে রাজাকে বশ করিয়াছে এবং গরীব ব্রাহ্মণদিগকে কষ্ট দেয়।' এই ভাবিয়া নারদ মহাদেবকে বলিলেন—"প্রভু ! এই দুষ্ট ব্রাহ্মণকে আপনি এরূপ অনুগ্রহ কেন করিতেছেন ?"

মহাদেব বলিলেন—"নারদ ! জানই ত আমি চাঁপা-ফুলের বড় ভক্ত। চাঁপাফুল দিয়া যে আমার পূজা করে,

সমস্ত পৃথিবী তাহার বশ হয়। সুতরাং আমি কি করিব? ঐ দুষ্ট ব্রাহ্মণ চাঁপাফুল দ্বারাই এরূপ ফল পাইয়াছে।”

মহর্ষি নারদ একথার উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার পিছনে পিছনে সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণও আসিল। তাহাকে দেখাইয়া ব্রাহ্মণী নারদকে বলিল—“প্রভু! এই দুষ্ট ব্রাহ্মণ আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহাকে বারণ করুন।”

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই ব্রাহ্মণ তোমাদের কি অনিষ্ট করিয়াছে?”

ব্রাহ্মণী বলিল—“ঠাকুর! আমার স্বামী পঙ্গু, আমরা অতিশয় দরিদ্র। আমার কন্যার বিবাহের বয়স হইয়াছে, তাহার বিবাহ দিবার জন্য আমার স্বামী রাজার নিকট হইতে ধন ভিক্ষা করিয়া লইয়াছেন। এখন সেই ধনের অর্দ্ধেক এই দুষ্ট লইতে চায় কেন? রাজার কাছে নালিশ করিয়াও কোন ফল নাই; কারণ এই ব্রাহ্মণ প্রতিদিন এই মন্দিরে শিবপূজা করিয়া, শিবের অনুগ্রহে রাজাকে বশ করিয়াছে। ধনের অর্দ্ধেক ভাগ না হয় দিলাম, কিন্তু রাজা যে আমাদিগকে একটি গাভী দিয়াছেন,

ব্রাহ্মণ বলে সেই গাভীরও অর্দ্ধেক তাহাকে দিতে হইবে। কি সর্ব্বনাশ! গরু কি করিয়া ভাগ করিব? তাহা হইলে যে আমাদের পাপের সীমা থাকিবে না!"

ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া নারদের বিষম রাগ হইল। তিনি মহাদেবকে বলিলেন—"প্রভু! এরূপ দুষ্ট মহাপাপীর পূজা আপনি গ্রহণ করেন?"

তখন মহাদেব বলিলেন—"নারদ! তোমাকে আমি বড় ভালবাসি—তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। যাহাতে এই ব্রাহ্মণ তাহার পাপের ফল ভোগ করিয়া সদ্গতি পায় এবং পুনরায় ভক্ত হয়, তাহাই করিবে।"

তখন নারদ চাঁপাগাছের নিকটে গিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"চম্পক! বল দেখি, কোন্ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন তোমার ফুল তুলিয়া নেয়?"

চম্পক এবারেও মিথ্যা কথাই বলিল। ইহাতে মহর্ষি নারদ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দিলেন—"ওরে মিথ্যাবাদী! আজ হইতে তোর ফুলে আর শিবপূজা হইবে না। তারপর মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়া সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"পাপিষ্ঠ! চাঁপাফুল দিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিস্, আর তাঁহার

অনুগ্রহে রাজাকে বশ করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে কষ্ট দিস্? সুতরাং আজ হইতে তুই রাক্ষস হ’।”

নারদের শাপে মহাভীত হইয়া, ব্রাহ্মণ তাঁহার পায়ে পড়িয়া মিনতি করিতে লাগিল। তখন নারদ তুষ্ট হইয়া বলিলেন—“আমার কথা মিথ্যা হইবে না, সত্যই তুমি রাক্ষস হইবে। তবে কি না, শ্রীরামচন্দ্রকে যখন দেখিবে এবং তাঁহার হস্তে যখন তোমার মৃত্যু হইবে, তখনই তোমার শাপও আর থাকিবে না—মহাদেবের অনুগ্রহে তুমি পুনরায় সুন্দর রূপ লাভ করিবে।”

নারদ এই কথা বলিলে, সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ ‘বিরাধ’ নামে মহাভয়ঙ্কর এক রাক্ষস হইল।

তারকাসুর

প্রজাপতি দক্ষের কন্যা দিতি ছিলেন কশ্যপের স্ত্রী। দৈত্যগণ সকলেই ছিল দিতির পুত্র। সত্যযুগে বিষ্ণু যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন এবং অন্য দানবগণও ইন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হয়, তখন দিতি তাঁহার স্বামী কশ্যপের নিকট বর চাহিলেন—"আমার ইন্দ্রের মত বলবান্ একটি পুত্র হউক।"

কশ্যপ বলিলেন—"হাজার বৎসর নিয়ম পালন করিয়া যদি শুদ্ধমনে থাকিতে পার, তবেই তোমার সেইরূপ পুত্র জন্মিবে।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ হাজার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে, একদিন দিনের বেলা ঘুমাইয়া দিতি নিয়ম ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রও সেই সুযোগে দিতির সন্তানটিকে জন্মিবার পূর্ব্বেই বজ্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন।

দিতি পুনরায় কশ্যপের নিকট বর চাহিলেন—"আমার এমন একটি পুত্র হউক—যে ইন্দ্রকে জয় করিবে

এবং দেবতাগণের অস্ত্র-শস্ত্র যাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

কশ্যপ বলিলেন—"যদি দশ হাজার বৎসর তপস্যা করিতে পার, তবে 'বজ্রাঙ্গ' নামে তোমার একটি পুত্র হইবে। তাহার শরীর হইবে বজ্রের মত কঠিন—অস্ত্র-শস্ত্র তাহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

দশ হাজার বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলে পর, দিতির এক পুত্র জন্মিল।

পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া সকল রকম শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয় হইল। সে মাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া বলিল—"মা! আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

দিতি বলিলেন—"বাবা! দেবরাজ ইন্দ্র আমার অনেক-গুলি পুত্র বধ করিয়াছেন, তুমি তাহার প্রতিশোধ লও!"

মহাবীর বজ্রাঙ্গ মায়ের কথায় তখনই স্বর্গে গেল এবং ইন্দ্রকে যুদ্ধে জয় করিয়া, মায়ের নিকট বাঁধিয়া আনিল।

এই সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মা ও কশ্যপ সেখানে আসিয়া বজ্রাঙ্গকে বলিলেন—"বাছা, ইন্দ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়া

তোমার কোন লাভ নাই। তাঁহার অপমান যথেষ্ট হইয়াছে—এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও।"

তাঁহাদিগের কথায় বজ্রাঙ্গ তখনই ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া বলিল—"আমি তপস্যা করিতে চাই। হে দেব, আপনার অনুগ্রহে আমার তপস্যায় যেন কোন বাধা না ঘটে।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"আচ্ছা তাহাই হইবে।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা পরম সুন্দরী এক কন্যা সৃষ্টি করিলেন, কন্যার নাম দিলেন 'বরাঙ্গী' এবং তাহাকে বজ্রাঙ্গের সহিত বিবাহ দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। ইহার পর বজ্রাঙ্গ স্ত্রীর সহিত বনে গিয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল।

বজ্রাঙ্গ এক হাজার বৎসর দুই হাত উপরের দিকে রাখিয়া তপস্যা করিল; তারপর হাজার বৎসর মাথা নীচু করিয়া, পরে হাজার বৎসর পাঁচটি আগুনের কুণ্ডের মধ্যে অনাহারে থাকিয়া তপস্যা করিল। ইহার পর হাজার বৎসর তপস্যা করিল জলের মধ্যে থাকিয়া। দৈত্য-পত্নী বরাঙ্গীও জলাশয়ের তীরে অনাহারে থাকিয়া এবং একটিও কথা না কহিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। তাহার তপস্যার তেজ দেখিয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের হইল মহা ভাবনা। তিনি বরাঙ্গীর তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য নানা

রকম অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। প্রকাণ্ড বানর সাজিয়া আশ্রমের জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করিলেন। বড় একটা সাপ হইয়া বরাঙ্গীকে ভয় দেখাইয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন। মেঘ হইয়া বরাঙ্গীর আশ্রম জলে ভাসাইয়া দিলেন—কিন্তু কিছুতেই বরাঙ্গীর তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, এইরূপে আরও হাজার বৎসর কাটিয়া গেলে, ব্রহ্মা আসিয়া বজ্রাঙ্গকে বর দিতে চাহিলেন। বজ্রাঙ্গ বলিল—"হে দেব! চিরকাল যেন তপস্যায় আমার মতি থাকে, আমার মনে যেন কোন মন্দ ভাব না আসে—আমাকে এই বর দিন।"

ব্রহ্মা "তথাস্তু" (তাহাই হউক) বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তপস্যার পর বজ্রাঙ্গ দেখিল, তাহার স্ত্রী বনের মধ্যে একস্থানে বসিয়া কাঁদিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

বরাঙ্গী বলিল—"হতভাগা ইন্দ্র আমাকে বড় কষ্ট দিয়াছে। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারে, এমন একটি পুত্র যদি আমার থাকিত, তবে সুখী হইতাম।"

স্ত্রীর দুঃখের কথা শুনিয়া বজ্রাঙ্গের বড় রাগ হইল। ইচ্ছা করিলে তখনই সে ইন্দ্রকে সাজা দিতে পারিত। কিন্তু সাধু দৈত্য তাহা না করিয়া, পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিল।

তখন ব্রহ্মা আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আবার কেন তপস্যা করিয়া শরীরকে কষ্ট দিতেছ?"

বজ্রাঙ্গ বলিল—"প্রভু! তপস্যা করিয়া এমন একটি পুত্র লাভ করিতে চাই, যে ইন্দ্রকে সাজা দিয়া তাহার অত্যাচারের শোধ লইতে পারে।"

তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"আমি বর দিলাম, তারক নামে তোমার মহাবলবান্ পুত্র হইবে; দেবতারা তাহার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইবেন।"

যথাসময়ে বরাঙ্গীর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্র জন্মিবামাত্রই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, ভীষণ বাতাস বহিতে লাগিল, মুনিঋষিগণ ভয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন—চারিদিক্ অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। তখন অসুরগণের আনন্দ দেখে কে! স্বর্গে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের ভয়ের সীমা রহিল না। [illegible]মাত্র,
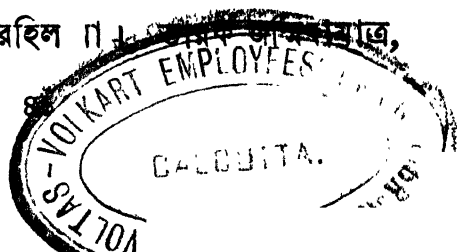
"তুমি আবার কেন তপস্যা করিয়া শরীরকে কষ্ট দিতেছ?"

কুজম্ভ, মহিষ প্রভৃতি মহাবলবান্ দানবেরা আসিয়া তাহাকে দৈত্যকুলের রাজা করিল।

রাজা হইয়া তারক পর্ব্বতের গুহায় মহাভয়ঙ্কর তপস্যা আরম্ভ করিল। কখন শুধু জলপান করিত, কখন অনাহারে থাকিত, আবার কখন শরীরের মাংস কাটিয়া আগুনে আহুতি দিত—এইরূপে শত শত বৎসর অতি কঠিন তপস্যা করিল।

তখন ব্রহ্মা আসিয়া তারককে বলিলেন—"বাছা! আর তপস্যা করিও না, আমি তোমাকে বর দিব।"

ইহা শুনিয়া তারক বর চাহিল—"কেহ যেন আমাকে যুদ্ধে হারাইতে না পারে এবং কোনও অস্ত্রে যেন আমার মৃত্যু না হয়।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"বাছা তারক! জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, কেহ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে না। সুতরাং যাহা হইতে মৃত্যুর কোনই আশঙ্কা নাই—এমন কোন লোকের হাতে তোমার মৃত্যু হইবার বর চাহিয়া লও।"

ইহা শুনিয়া তারক মোহবশতঃ বর চাহিল—"হে প্রভু! সাত দিনের শিশুর হাতে যেন আমার মরণ হয়।"

ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন।

এখন তারকের ক্ষমতার আর সীমা নাই। দেবতারা তাহার ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির। চন্দ্র-সূর্য্য তাহার রাজ্যে আলো দেন, পবন তাহাকে বাতাস করেন, আর স্বয়ং যম সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া চাকরের মত তাহার কাজ করেন।

এইরূপে অনেক দিন কাটিল। একদিন তারক খুব স্পর্দ্ধা করিয়া মন্ত্রীদিগকে বলিল—"আমি যদি স্বর্গই আক্রমণ না করিলাম তবে রাজত্ব করিয়া লাভ কি? অতএব শীঘ্র যুদ্ধের আয়োজন কর, আমার আট চাকার রথ প্রস্তুত হউক।"

তখন সেনাপতি মহাবীর গ্রসন ভেরী বাজাইয়া দানব-সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে বলিল। তারকের আট চাকার রথ প্রস্তুত লইল, এক হাজার ঘোড়া সেই রথ টানে। সে কি যেমন-তেমন রথ! চারি যোজন স্থান জুড়িয়া রথ-খানি; তাহার চারিদিক সাদা কাপড়ে ঢাকা। দশ কোটি মহাবলবান্ দৈত্য যুদ্ধের জন্য সাজিল। গ্রসন, জম্ভ, কুজম্ভ, মহিষ, মেষ, কালনেমি, নিমি, মথন, জম্ভক ও শুম্ভ—এই দশ মহাযোদ্ধা তাহাদের দলপতি।

তারকের রথের চূড়ায় সোনার নিশান, গ্রসনের ধ্বজে

মকর, জম্ভের ধ্বজে লৌহনির্ম্মিত পিশাচ-মুখ, কুজম্ভের ধ্বজে গাধা, মহিষের রথে সোনার শৃগাল এবং শুম্ভাসুরের ধ্বজে কাকের আকৃতি নিশান। ইহাদিগের রথের চূড়াগুলি যেমন অদ্ভুত, তেমনই অদ্ভুত বাহনগুলি। সেনাপতি গ্রসনের রথের বাহন একশতটা বাঘ, জম্ভাসুরের একশতটা সিংহ, কুজম্ভের রথে অনেকগুলি পিশাচ-মুখ গাধা এবং মহিষের রথের বাহন অনেকগুলি উট! এইরূপ নানা রকমের অদ্ভুত বাহনের রথে চড়িয়া দৈত্য-দলপতিগণ যুদ্ধে যাত্রা করিল।

দূতমুখে এই সংবাদ পাইয়া, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও প্রস্তুত হইলেন। ইন্দ্রের রথখানি অযুত ঘোড়ায় টানে, তাহার চূড়ায় সোনার হাতী আর মাতলি তাহার সারথি। যমরাজা দণ্ড হস্তে মহিষে চড়িয়া প্রস্তুত হইলেন। অগ্নির হাতে ভীষণ শক্তি আর তাঁহার বাহন ছাগল। হস্তে অব্যর্থ অঙ্কুশ লইয়া পবন প্রস্তুত হইলেন। বরুণ চলিলেন সর্পারোহণে, আর কুবের মানুষে-টানা রথে চড়িয়া। চন্দ্র, সূর্য্য, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ দলবল লইয়া সাজিলেন। ইহা ছাড়া যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি সকলেই আসিল।

উভয় দলে মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের স্রোত বহিল।

যমরাজ দৈত্য-সেনাপতি গ্রসনকে আক্রমণ করিলেন। তিনি তাহাকে ভয়ঙ্কর বাণসকল মারিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু গ্রসন হাসিতে হাসিতে সমস্ত বাণ কাটিয়া তাঁহাকে পঞ্চাশটি বাণ মারিল—যম একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন যম রাগিয়া গ্রসনের রথের উপরে ভীষণ এক মুদ্গর ছুড়িয়া মারিলেন, কিন্তু সে লাফ দিয়া শূন্যের মধ্যেই বাঁ-হাতে সেই মুদ্গর ধরিয়া ফেলিল। শুধু তাহাই নহে, আবার সেই মুদ্গর দিয়াই যমের বাহন মহিষটিকে ধরাশায়ী না করিয়া ছাড়িল না। ইহাতে যম রাগিয়া পাশাস্ত্র দিয়া তাহাকে এমনই আঘাত করিলেন যে, সে মাটিতে পড়িয়া একেবারে অজ্ঞান! তখন জম্ভাসুর ভয়ঙ্কর এক ভিন্দিপাল দিয়া যমের বুকে এমন দারুণ আঘাত করিল যে তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল!

এদিকে সেনাপতি গ্রসন চেতনা পাইয়া যমের উপর সাঙ্ঘাতিক এক গদা ছুড়িয়া মারিল। যম তৎক্ষণাৎ তাহার উপর ভীষণ কালদণ্ড ছাড়িলেন। আকাশে এই

দুই অস্ত্রে ঠোকাঠুকি হইয়া, ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির হইতে লাগিল। মনে হইল যেন সৃষ্টি পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। কিন্তু শেষে যমদণ্ডেরই জয় হইল— অসুরের গদাকে চূরমার করিয়া দণ্ড গ্রসনের মাথায় পড়িবামাত্র পুনরায় তাহার জ্ঞান লোপ পাইল।

ক্ষণকাল পরে চেতনা পাইয়া গ্রসন ভাবিল—'আমি যদি এখন হারিয়া যাই, তবে সৈন্যদল নষ্ট হইবে।' এই ভাবিয়া সে প্রাণপণ শক্তিতে দারুণ এক মুদ্গর লইয়া যমের মাথা লক্ষ্য করিয়া ছাড়িল। যম চক্ষের নিমেষে সরিয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু মুদ্গর অনেকগুলি যমকিঙ্করকে বধ না করিয়া ছাড়িল না। তখন যমকিঙ্কর-গণ ভীষণ রাগিয়া চারিদিক্ হইতে গ্রসনকে আক্রমণ করিল। গ্রসন গদা দিয়া, শূল দিয়া এবং মুদ্গর দিয়া অনেকগুলি মারিল বটে, কিন্তু কিঙ্করেরা তবু তাহাকে ছাড়িল না। কেহ তাহার হাতে ঝুলিল, তাহাকে কামড়াইয়া, কেহ কীলাইয়া তাহাকে অস্থির ও ক্লান্ত করিয়া ফেলিল।

তখন যমও তাহাকে পুনরায় আক্রমণ করিলেন এবং দণ্ড দিয়া তাহার রথের বাঘগুলিকে মারিয়া শেষ করিলেন।

তখন গ্রসন রথ হইতে নামিয়া, যমের সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয়ে মিলিয়া অনেকক্ষণ চড় চাপড় মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে, যম ক্লান্ত হইয়া দানবের কাঁধের উপর ঢুলিয়া পড়িলেন। এই সুযোগে দানব গ্রসন তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া এমনই প্রহার করিল যে, যম সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়া মরার মত পড়িয়া রহিলেন! তখন গ্রসনের আস্ফালন দেখে কে?

এদিকে কুবের দারুণ এক শূল দিয়া সত্তর হাজার দানব বধ করিয়া, জম্ভাসুরের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়াছেন। জম্ভাসুর এক পরশু মারিয়া কুবেরের রথটাকে তিন তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিল। কুবেরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গদার আঘাতে জম্ভাসুরকে অচেতন করিয়া ফেলিলেন। তখন দানব কুজম্ভ কুবেরকে আক্রমণ করিল। কুবের তাঁহার শক্তি দিয়া তাহাকেও অজ্ঞান করিলেন। খানিক পরেই চেতনা পাইয়া, কুজম্ভ তাঁহাকে ভয়ঙ্কর এক পট্টিশ দিয়া এমনই আঘাত করিল যে, কুবের অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

ইহা দেখিয়া রক্ষপতি নিঋ্ঁতি তামসী মায়ায় চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া কুজম্ভকেও মোহিত করিলেন।

দানবসৈন্যেরা আর চক্ষে দেখিতে পায় না, তাহারা অন্ধকারে একপা-ও অগ্রসর হইতে পারিল না। এই সময়ে মহিষাসুর অদ্ভুত সূর্য্যাস্ত্র মারিয়া অন্ধকার দূর করিলে পর, দানব কুজম্ভ দারুণ ক্রোধে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, রক্ষপতি নির্ঋতির চুলের মুঠি ধরিল এবং খড়্গ দ্বারা তাঁহার মাথা কাটিতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া বরুণদেব তাঁহার পাশাস্ত্র দ্বারা চক্ষের নিমেষে দানবের দুটি হস্ত বাঁধিয়া ফেলিলেন; তারপর গদা দিয়া তাহাকে এরূপ সাঙ্ঘাতিক আঘাত করিলেন যে, সে রক্ত বমি করিতে লাগিল।

কুজম্ভের এই দুরবস্থা দেখিয়া, মহিষাসুর বিশাল হাঁ করিয়া নির্ঋতি ও বরুণকে গিলিতে আসিল। নির্ঋতি ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া ইন্দ্রের রথে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু বরুণ ছুটিয়াই চলিলেন—তাঁহার পিছনে মহিষাসুরও হাঁ করিয়া তাড়া করিল।

এই সময়ে চন্দ্রদেব যুদ্ধ করিতে আসিলেন বলিয়া বরুণের রক্ষা। চন্দ্র সোমাস্ত্র ও আয়ব্যাস্ত্র মারিতেই দারুণ শীতে দৈত্যদিগের শরীর অসাড় হইয়া গেল। দুরন্ত মহিষ শীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তখন মায়াবলে যুদ্ধক্ষেত্রে অযুত সূর্য্যের সৃষ্টি করিল দানব কালনেমি। এতগুলি সূর্য্যের তেজে কি আর শীত থাকিতে পারে? দানবসৈন্যগণ সুস্থ হইয়া আবার 'মার মার' শব্দে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া সূর্য্যদেব সারথিকে বলিলেন—"ওহে অরুণ! শীঘ্র আমার রথ কালনেমির নিকট লইয়া যাও।"

কালনেমির নিকট গিয়াই সূর্য্যদেব ভীষণ সঞ্চারাস্ত্র মারিলেন। আর দেখিতে দেখিতে দেবতারা দানবরূপ এবং দানবেরা দেবতার রূপ ধরিল। ক্রুদ্ধ কালনেমি এই মায়া বুঝিতে না পারিয়া, দেবতা ভাবিয়া চক্ষের নিমেষে দশলক্ষ দানবসৈন্যই মারিয়া ফেলিল! তখন নেতি নামে এক দৈত্য কালনেমিকে বলিল—"ওহে কালনেমি! তুমি এ কি করিলে? সূর্য্যের অস্ত্রে মোহিত হইয়া, আমাদেরই যে দশলক্ষ সৈন্য মারিয়া ফেলিয়াছ! শীঘ্র ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়, নতুবা আর উপায় নাই।"

নেতি দানবের কথায় কালনেমি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িবামাত্র সূর্য্যের সঞ্চারাস্ত্র শান্ত হইয়া গেল।

ইহা দেখিয়া সূর্য্য দারুণ ক্রোধে ইন্দ্রজাল দ্বারা নিজের শরীরটাকে কোটি ভাগ করিয়া ফেলিলেন। এক সূর্য্যের

উত্তাপেই রক্ষা নাই, তাহার উপর কোটি সূর্য্যের তেজ! দানবসৈন্যগণ সে তেজ সহ্য করিতে পারিবে কেন? তাহারা গরমে অস্থির হইয়া চারিদিকে জলের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল, তাহাতে চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল, শরীরে ঘামের স্রোত বহিল। তৃষ্ণায় তালু ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু জলের নিকটে যাইবার শক্তি নাই। যে যেখানে ছিল, অচেতন অবস্থায় সেখানেই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

তখন দুরন্ত কালনেমি, আবার অদ্ভুত মায়াবলে সূর্য্যের মায়াকে নষ্ট করিয়া, দানবসৈন্যের উপর শীতল জল বর্ষণ করিতে লাগিল। তারপর সে এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিতে লাগিল যে, দেবতারা ভয়ে অস্ত্র ও রথ ফেলিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে ইন্দ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। দুষ্ট কালনেমিও পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া সেখানে গেল।

এদিকে বিষ্ণু, দেবতাগণের এই দুরবস্থার কথা জানিতে পারিয়া, গরুড়কে স্মরণ করিলেন এবং গরুড়ের পিঠে চড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অসুরগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহারা বলিতে লাগিল—“ওহে, এই বিষ্ণুই দেবতাদের একমাত্র সম্বল,

ইহাকে জিতিতে পারিলেই দেবতারা জব্দ হইবে।" এই বলিয়া, গ্রসন, কালনেমি, নিমি, মথন, জম্বক ও শুম্ভ প্রভৃতি মহাবলবান্ দৈত্যগণ একসঙ্গে বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল। নিমি দৈত্য ভল্লের আঘাতে বিষ্ণুর ধনু কাটিল, জম্ভাসুর বাণের পর বাণ মারিয়া, গরুড়কে অস্থির করিয়া দিল। শুম্ভাসুর এক বাণ মারিয়া বিষ্ণুর হাতটিতে আঘাত করিল। তখন বিষ্ণু রৌদ্রাস্ত্র ছাড়িলেন, নিমেষে মধ্যে চারিদিক্ বাণে ছাইয়া ফেলিল। গ্রসনাসুর রৌদ্রাস্ত্রকেও শান্ত করিল ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা।

নারায়ণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্রোধে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মহাভয়ঙ্কর সুদর্শন চক্র মারিয়া দৈত্যসেনাপতি গ্রসনের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর বিষ্ণু গরুড়কে বলিলেন—"যদি ক্লান্ত হইয়া থাক, তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া লও। নতুবা শীঘ্র আমাকে মথনাসুরের নিকট লইয়া চল।"

গরুড় তখনই মথনাসুরের নিকট গিয়া উপস্থিত। বিষ্ণু গদা দিয়া মথনাসুরকে এমনই আঘাত করিলেন যে, দুষ্ট দানব রথসহ চূরমার হইয়া গেল।

মথনাসুরের মৃত্যুতে মহিষাসুর রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, প্রকাণ্ড হা করিয়া বিষ্ণুকে গিলিতে আসিল। বিষ্ণু দিব্যাস্ত্র মারিয়া দানবের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিলেন! তারপর আর একটি বাণের আঘাতে মহিষাসুর মাটিতে লুটাইয়া পড়িল—কিন্তু একেবারে মরিল না।

তখন বিষ্ণু তাহাকে বলিলেন—"হে মহিষাসুর! ব্রহ্মার বরে কুমারীর হাতে তোমার মৃত্যু হইবে। সুতরাং আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম—এখন শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন কর।

মহিষাসুর পলায়ন করিলে পর, বিষ্ণু ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া শুম্ভ দৈত্যকেও জয় করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন—"তুমি অল্পদিনের মধ্যেই স্ত্রীলোকের হাতে মরিবে, সুতরাং এখন আর যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই—প্রস্থান কর।"

তখন নিমি প্রচণ্ড এক গদা লইয়া গরুড়ের মাথায় এবং জম্ভাসুর ভীষণ এক পরিঘ লইয়া বিষ্ণুর মাথায় এমনই আঘাত করিল যে, বিষ্ণু ও গরুড় অজ্ঞান হইয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে উভয়ের চেতনা হইলে, গরুড় বিষ্ণুকে লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর জন্ম এবং শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ—এসব কথা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। বিবাহের পর, কালক্রমে দেবী পার্ব্বতীর পরম-সুন্দর একটি পুত্র জন্মিল। বালকের ছয়টি মুখ, শরীর সূর্য্যের মত উজ্জ্বল, সোনার মত রং। জন্মিয়াই তিনি তীক্ষ্ণ শক্তি ও শূল হস্তে লইলেন। তাঁহার নাম হইল 'কুমার' (কার্ত্তিকেয়)।

জন্মের পর ষষ্ঠীর দিনে, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা-গণ আসিয়া তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়া বলিলেন—"দৈত্যরাজ তারকের উৎপাতে আমরা আর স্বর্গে থাকিতে পারিতেছি না, আপনি তাহাকে বধ করুন।"

ইহা শুনিয়া কার্ত্তিক তখনই দেবতাগণের সঙ্গে চলিলেন। ইন্দ্র দূত দ্বারা তারককে বলিয়া পাঠাইলেন—"দুষ্ট দানব! তুমি অনেক পাপ করিয়াছ, আজ সেই পাপের শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও।"

দূতের কথা শুনিয়া তারক ভাবিল—'নিশ্চয়ই ইন্দ্র কোন সহায় পাইয়াছে, নতুবা এরূপ বলিতে কখনই সাহস পাইত না।' এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তারক দেখিল, দেবতাগণ দলবল লইয়া আসিয়া উপস্থিত।

দলের অগ্রভাগে এক অদ্ভুত বালক যোদ্ধা! তারক বুঝিতে পারিল—তাহার মৃত্যুর সময় আসিয়াছে।

এই কথা স্মরণ করিয়া, দৈত্যরাজ শরীরে বর্ম্ম আঁটিল না, সঙ্গে কোন লোকও লইল না—একাকী হাঁটিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে চলিল। কালনেমি প্রভৃতি দানবগণকে বলিয়া গেল—"তোমরা সকলে শীঘ্র আমার পিছনে আইস।"

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াই তারক কার্ত্তিককে বলিল—"ওহে বালক! এ বয়সে তোমার মত শিশুরা খেলা করে, তুমি কেন যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ?"

কার্ত্তিক বলিলেন—"তারক! শিশু বলিয়া আমাকে অবহেলা করিও না। জানিও এই শিশুর হস্তেই আজ তোমার মৃত্যু।"

কার্ত্তিক এই কথা বলিলে, তারক তখনই তাঁহার উপর ভয়ঙ্কর এক মুদ্গর ছাড়িল, কুমার বজ্র দিয়া সে মুদ্গর কাটিলেন। তারক লোহার ভিন্দিপাল মারিল, কার্ত্তিক সেটাকে ধরিয়া ফেলিয়া, তাহাকে ভীষণ এক গদা দিয়া আঘাত করিলেন। দারুণ আঘাতে দৈত্যরাজের শরীর থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল যে, সত্য সত্যই তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এদিকে কালনেমি প্রভৃতি দানবগণও আসিয়া কার্ত্তিকের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দানবেরা কত যে মহা মহা অস্ত্র মারিল, কিন্তু কুমারের তাহাতে একটুও ব্যথা বোধ হইল না। তিনি এমনই ভয়ঙ্কর বাণ সকল মারিতে লাগিলেন যে, দানবেরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, ছুটিয়া পলায়ন করিল।

তাহা দেখিয়া দৈত্যরাজ তারক ভয়ঙ্কর রাগিয়া, এক গদা দ্বারা তাঁহার ময়ূরকে আহত করিল। তখন কার্ত্তিক স্বর্ণমণ্ডিত এক অদ্ভুত শক্তি হাতে লইয়া তারককে বলিলেন—"ওরে দুষ্ট দানব! একবার শেষ দেখা দেখিয়া লও, এই শক্তির আঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে। যদি তোমার নিকট কোন দিব্য অস্ত্র থাকে, তবে এই বেলা তাহা ছাড়।" এই বলিয়া কুমার সেই মহাশক্তি তারকের উপর ছুড়িয়া মারিলেন।

দারুণ শক্তির আঘাতে দৈত্যরাজ তারকের পর্ব্বতের মত কঠিন শরীর চুরমার হইয়া গেল!

দেবতারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

ব্রাহ্মণীর গঙ্গালাভ

রেস নদীর পশ্চিম তীরে কর্ণকী নগর। সেখানে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি পুত্র ছিল। বৃদ্ধবয়সে ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে পুত্র দুইটির নিকট রাখিয়া, ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য কাশী গেলেন। সেখানে কালক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইল।

স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণী পুত্রদিগের দ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। তারপর পুত্রদিগের বিবাহ দিলেন এবং বধূ দুইটির উপর সংসারের ভার দিয়া নিজে পুণ্যকাজে মন দিলেন।

এইরূপে কিছুদিন চলিল। তারপর যথাসময়ে ব্রাহ্মণীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, কিছুতেই তাঁহার প্রাণ আর দেহ ছাড়িতে চাহে না। ব্রাহ্মণী বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

মায়ের কষ্ট দেখিয়া একদিন পুত্রেরা জিজ্ঞাসা করিল —"মা! আপনার কি কোন কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে? কিসের জন্য এত কষ্ট পাইতেছেন? বলুন—আমরা নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"বাবা! আমার একান্ত ইচ্ছা

ছিল, বৃদ্ধবয়সে কাশীবাস করিব; কিন্তু এখন আমার মৃত্যু উপস্থিত, সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হইল না। যাহা হউক, আমার মৃত্যুর পর তোমরা যদি আমার অস্থি নিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিবে বলিয়া কথা দাও, তবেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি। আর আমার আশীর্ব্বাদে তোমাদের কল্যাণ হইবে।"

পুত্রেরা প্রতিশ্রুত হইলে, ব্রাহ্মণী সন্তুষ্ট মনে প্রাণত্যাগ করিলেন। মাতার মৃত্যুর পর যথানিয়মে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবাদী মায়ের অস্থি লইয়া একজন চাকরের সহিত গঙ্গার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

কোথায় গঙ্গা, কত দেশ পার হইয়া যাইতে হইবে, পথে কত বিপদ-আপদ, ব্রাহ্মণ-সন্তান তাহাতে বিচলিত হইলেন না।

সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় সুবাদী শুভগ্রামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ীতে ছিলেন না, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া অতিথিকে খুব আদর-যত্ন করিলেন।

গৃহে ফিরিবার পর ব্রাহ্মণ দেখিলেন গাভীটিকে

দোহান হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি বাছুরটিকে লইয়া আসিলেন। গাই দোহাইবার সময় বাছুরটিকে খোঁটায় বাঁধিবার জন্য ব্রাহ্মণ যতই টানেন ততই বাছুর যাইতে চায় না। শেষে টানের চোটে বাছুর রাগিয়া, ব্রাহ্মণের পায়ে এক লাথি মারিল।

যাহা হউক, অতিকষ্টে বাছুরটাকে খোঁটায় বাঁধিয়া ব্রাহ্মণ গাই দোহাইলেন; আর, তাঁহাকে লাথি মারিবার দরুণ রাগিয়া বাছুরকে প্রহার ত করিলেনই—তাহার উপর খোঁটার বাঁধনও খুলিয়া দিলেন না।

বাছুরের দুর্দ্দশা দেখিয়া গাই মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বাছুর বলিল—"মা! তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

গাই বলিল—"বাছা! দুষ্ট ব্রাহ্মণ মিছামিছি তোমাকে প্রহার করিল, তাই মনের দুঃখে কাঁদিতেছি।"

বাছুর মাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গাভীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। সে বলিল,—"আমি যেমন দুঃখ পাইলাম, তেমন দুঃখ যখন দুষ্ট ব্রাহ্মণ পাইবে তখনই আমার শান্তি হইবে। কাল আমি গুঁতাইয়া ব্রাহ্মণের পুত্রকে বধ করিব;

তখন ব্রাহ্মণ আমার দুঃখ বুঝিতে পারিবে এবং আমার মনেও তখন সান্ত্বনা পাইব।”

বাছুর ভয় পাইয়া বলিল—“মা! এরূপ অন্যায় কাজ আপনি কখনই করিবেন না। ব্রহ্মহত্যায় গুরুতর পাপ, ঐ পাপ নাকি দূর হয় না।”

গাভী বলিল—“তাহার জন্য চিন্তা কি? যেখানে গেলে ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়, সে স্থান আমি জানি—ব্রাহ্মণ-কুমারকে বধ করিয়া আমি সেখানে চলিয়া যাইব। একটি কথা মনে রাখিও—ব্রাহ্মণ-পুত্রকে বধ করিবামাত্র আমার এই সাদা রং কালো হইয়া যাইবে, আবার পাপ দূর হইলে দেখিতে পাইবে, আমার পূর্ব্বের ন্যায় সাদা রং হইয়াছে।”

গাভী এবং বাছুরের মধ্যে এই অদ্ভুত কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া পথিক ব্রাহ্মণ সুবাদী ভাবিলেন—‘কাল প্রাতঃকালে এই ব্যাপার না দেখিয়া, এখান হইতে যাইব না।’

পরদিন প্রাতঃকালে গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ জাগিয়া অতিথিকে বলিলেন—“আপনি এখনও শুইয়া আছেন? বেলা হইল যে, যাইবেন কখন?”

সুবাদী বলিলেন—“মহাশয়! আমার সঙ্গী চাকরটির

শরীরে বেদনা হইয়াছে, খানিক পরে যাইব।" এইরূপে ফাঁকি দিয়া সুবাদী শুইয়া রহিলেন।

এদিকে গৃহস্বামী কাজে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় পুত্রকে বলিয়া গেলেন—"আমি কাজে যাইতেছি, তুমি গাইটাকে দোহাইও।"

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে তাঁহার পুত্র বাছুরের বাঁধন খুলিয়া, গাই লইয়া আসিল। তারপর বাছুরকে পুনরায় বাঁধিবার জন্য খোঁটার নিকটে উপুড় হওয়ামাত্র, ক্রুদ্ধ গাভী শিং দিয়া তাহাকে এমনই গুঁতা মারিল যে, সে মাটিতে পড়িয়া একেবারে অজ্ঞান!

অমনি "গরুতে ছেলে মারিয়াছে, গরুতে ছেলে মারিয়াছে" বলিয়া চারিদিক্ হইতে চীৎকার-শব্দ উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে লোক জড় হইয়া গেল। কেহ জল ছিটাইয়া দিল, কেহ ছেলেকে বাতাস করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই সে চক্ষু মেলিল না, এক আঘাতেই তাহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

সকলের চক্ষু স্থির! ব্রাহ্মণের চাকর তখন লাঠি লইয়া গাইটাকে প্রহার করিতে করিতে তাড়াইয়া দিল। এই সময়ে সুবাদী এবং অন্য সকলে দেখিল—গাভীর

ধব্‌ধবে সাদা রং হঠাৎ কালো হইয়া গিয়াছে! এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সকলের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এদিকে, প্রহার খাইয়া গাভী লেজ তুলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। ব্রাহ্মণ সুবাদীও চাকরের সহিত তাহার পিছন পিছন চলিলেন।

নর্ম্মদা নদীর তীরে নন্দিকেশ তীর্থ ছিল। গাভী সেখানে গিয়া নর্ম্মদার জলে তিনবার স্নান করিল।

স্নান শেষ করিয়া তীরে উঠিবামাত্র, সুবাদী দেখিলেন গাভীর রং পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সাদা হইয়াছে! তিনি সবিস্ময়ে ভাবিলেন—'কি আশ্চর্য্য! এই তীর্থ ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর করে!' তখন তিনি এবং তাঁহার চাকর উভয়ে সেই তীর্থে স্নান করিলেন।

নর্ম্মদাস্নানে ব্রহ্মহত্যা-পাপ দূর করিয়া, গাভী পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছিল, সুবাদীও স্নানের পর তীর্থের প্রশংসা করিতে করিতে ফিরিয়া চলিলেন। পথে পরমা সুন্দরী এক রমণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মণ! তুমি কোথায় যাইতেছ, সত্য করিয়া বল।"

সুবাদী আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বর্ণন

"ব্রাহ্মণ! তুমি কোথায় যাইতেছ, সত্য করিয়া বল"

করিলে, রমণী পুনরায় বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি ক্ষান্ত হও। যেখানে স্নান করিয়াছ, সেইখানে তোমার মাতার অস্থি বিসর্জ্জন কর—তিনি স্বর্গে যাইবেন। বৈশাখ মাসে, শুক্লপক্ষের সপ্তম দিনে গঙ্গাদেবী এই তীর্থে আসেন। আজ সপ্তমী, আর আমিই গঙ্গা—আমি নন্দিকেশ তীর্থে যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সুবাদী নন্দিকেশ তীর্থে ফিরিয়া আসিয়া নর্ম্মদার জলে মাতার অস্থি ফেলিবামাত্র তাঁহার মাতা দিব্য শরীর ধরিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন—"হে পুত্র! তুমি ধন্য! তুমি আমাদের কুল পবিত্র করিয়াছ। তোমার ধন-মান বাড়ুক—তুমি দীর্ঘায়ু হও।" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি সশরীরে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

বীরক

(মৎস্য-পুরাণ)

পুরাকালে একদিন মহাদেব কৈলাসপর্ব্বতে, মন্দিরের মেঝেতে বসিয়া, দেবী পার্ব্বতীর সঙ্গে পাশা খেলিতেছিলেন —এমন সময় হঠাৎ ভারি একটা কোলাহল শুনিয়া, দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—“ওটা কিসের শব্দ ?”

মহাদেব বলিলেন—“ও কিছু নয়। আমার গণেরা পর্ব্বতে খেলা করিতেছে, ইহা তাহারই কোলাহল।”

এই কথা শুনিয়া দেবীর অতিশয় কৌতূহল হইল, তিনি জানালায় গিয়া গণদিগের খেলা দেখিতে লাগিলেন। গণদিগের মধ্যে একটি নিতান্ত বালক, লাল টুক্‌টুকে তাহার মুখখানি, চেহারাটি ভারি সুন্দর—দেখিলেই স্নেহ হয়। দেবী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ঐ বালকটি কে ? উহার নাম কি ?”

মহাদেব বলিলেন—“এই বালকও একজন গণ, নাম বীরক—ইহাকে আমি বড় ভালবাসি। এই বালক অত্যন্ত গুণবান্, অন্য গণেরা ইহাকে খুব সম্মান করে।”

বীরককে দেখিয়া তাহার প্রতি পার্ব্বতীর অত্যন্ত স্নেহ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—"এই বালক আমার পুত্র হইলে সুখী হইতাম।"

মহাদেব বলিলেন—"তবে বীরক তোমার পুত্রই হউক—বীরকও তোমার মত মা পাইয়া কৃতার্থ হইবে।"

ইহা শুনিয়া পার্ব্বতীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি তখনই সখী বিজয়াকে পাঠাইয়া, বীরককে ডাকিয়া আনিলেন। বীরক আসিলে দেবী তাহাকে কোলে লইয়া কত আদর করিলেন, আর বলিলেন—"বাছা! মহাদেব তোমাকে আমায় দান করিয়াছেন। এখন হইতে আমি তোমার মা হইলাম।"

তখন হইতে দেবী বীরককে অত্যন্ত আদর-যত্ন করেন, সর্ব্বদা তাহাকে নিকটে রাখেন, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে চক্ষের আড়াল করিতে পারেন না। বীরকও দিনে দিনে তাঁহার নিতান্ত বশ হইয়া পড়িল।

এই ভাবে কিছুদিন গেলে পর, হঠাৎ এক দুর্ঘটনা উপস্থিত! পার্ব্বতী পূর্ব্বে ছিলেন শ্যামবর্ণা। একদিন আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে মহাদেব তামাসা করিয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন—"তুমি অসিতবর্ণা (কালো)!"

"বাছা! মহাদেব তোমাকে আমায় দান করিয়াছেন।"

একথায় দেবীর কিন্তু ভারি রাগ হইল। তিনি বলিলেন —"বটে! তোমার জন্য কত তপস্যা করিয়াছিলাম, তুমি বুঝি এখন তাহার এই পুরস্কার দিলে? যাহা হউক, আমার এই শ্যামবর্ণ শরীর এখনই বিসর্জ্জন করিব।"

দেবীর অভিমান দেখিয়া মহাদেব ভাবনায় পড়িলেন। তিনি কত মিনতি করিলেন, কত ক্ষমা চাহিলেন, কিন্তু তবু দেবীর রাগ গেল না।

তখন মহাদেবও একটু গরম হইয়া বলিলেন—"অন্যায় স্বীকার করিলাম, এত সাধাসাধি করিলাম—তবু তোমার রাগ গেল না? তাহা ত হইবেই—পর্ব্বতের মেয়ে কিনা, তাই মনটা একেবারে পাথরের মত কঠিন! সেই জন্যই শরীরের রংটাও পাথরের মত। হিমালয়ের সব গুণই পাইয়াছ দেখিতেছি!"

তখন দেবী আরও রাগিয়া বলিলেন—"বৃথা কেন গুরুজনদিগকে নিন্দা করিতেছ? তোমার নিজের কি কোন দোষ নাই? সাপ তোমার অঙ্গের ভূষণ, সেজন্য সাপের মত তোমার কুটিল মন। শরীরে ভস্ম মাখ, তাই মনে স্নেহ-মমতা নাই! বলদ তোমার বাহন, সেজন্য বুদ্ধিও জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, তোমার সঙ্গে

আর বেশী তর্ক করিয়া ফল নাই।" এই বলিয়া দেবী রাগে গর্-গর্ করিতে করিতে মন্দির হইতে বাহির হইলেন।

এমন সময় বীরক আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিল—"মা! কি হইয়াছে? আপনি রাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন? আপনি চলিয়া গেলে আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। নতুবা এই পর্ব্বত হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব—একথা নিশ্চিত জানিবেন।"

দেবী বীরকের মুখখানি ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি দুঃখ করিও না। আমার সঙ্গে যাইবার কিংবা প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার প্রয়োজন নাই। মহাদেব মিছামিছি আমাকে 'কালো' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। অতএব আমি বনে গিয়া তপস্যা করিয়া গৌরবর্ণা হইব। তুমি এখানে থাকিয়া সর্ব্বদা পাহারা দিবে—যেন অন্য কেহ মহাদেবের নিকট না যায় এবং তাঁহার কোন অনিষ্ট না করে। কেহ ভিতরে গেলে, তখনই আমাকে সংবাদ দিবে।"

এই বলিয়া পার্ব্বতী তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বে অন্ধক নামে এক মহা বলবান্ দৈত্যকে মহাদেব বধ করিয়াছিলেন। অন্ধকের পুত্র আড়ি দৈত্য পার্ব্বতীর

তপস্যার কথা জানিতে পারিয়া, পিতৃশত্রু মহাদেবের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছায়, কৈলাসপর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল; আসিয়াই দেখিল, মন্দিরের দরজায় বীরক প্রহরী। দেখিয়া তাহার মনে ভাবনা হইল।

অন্ধক দৈত্যকে মহাদেব যখন বধ করিয়াছিলেন, তখন এই আড়ি দৈত্য ব্রহ্মার তপস্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলে, সে অমর হইবার বর প্রার্থনা করে। কিন্তু ব্রহ্মা তাহাকে সে বর দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন আড়ি দৈত্য বলিয়াছিল—"আচ্ছা প্রভু! তবে, আমার রূপ না বদ্‌লাইলে যেন আমার মরণ না হয়—আমাকে এই বর দিন্।" ব্রহ্মা তাহাকে সেই বরই দিলেন। আড়ি দৈত্য তখন ঐরূপ বর যথেষ্ট মনে করিয়াছিল।

এখন বীরককে দরজায় প্রহরী দেখিয়া সে মনে করিল, সাপের রূপ ধরিয়া ঘরে ঢুকিবে, আর এই রূপ বদ্‌লাইতে হইবে ভাবিয়াই তাহার মনে চিন্তা হইয়াছিল।

যাহা হউক, সাপের বেশে বীরককে ফাঁকি দিয়া, দুষ্ট দৈত্য মহাদেবের পুরীতে প্রবেশ করিল। বীরক বেচারী এই ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

এই দিকে পুরীতে প্রবেশ করিয়া, দুষ্ট দানব পার্ব্বতীর রূপ ধরিল। দানবী মায়ার বলে সে অবিকল পার্ব্বতীই সাজিল, কিন্তু মুখের মধ্যে খুব শক্ত এবং ধারাল কয়েকটা দাঁত রাখিয়া দিল—মহাদেবকে কামড়াইয়া মারিবার জন্য।

পার্ব্বতী-রূপী দৈত্য মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলে, মহাদেব মনে করিলেন, সত্য সত্যই পার্ব্বতী ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন ভারি খুশী হইয়া বলিলেন —"এত দিনে বুঝিলাম, তুমি বাস্তবিকই আমাকে খুব ভালবাস। তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে, আমার বড় কষ্ট হইয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া দুষ্ট দানব হাসিতে হাসিতে বলিল— "আমি গৌরবর্ণ পাইবার জন্য তপস্যা করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার কথা মনে করিয়া সেখানে আমার আর ভাল লাগিল না। তাই ফিরিয়া আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া মহাদেবের মনে কেমন জানি সন্দেহ হইল। তিনি ভাবিলেন—'এ বড় আশ্চর্য্য কথা! পার্ব্বতী তপস্যার জন্য গেলেন, আর তাহা শেষ না করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন—তাঁহার মন ত এরূপ দুর্ব্বল নয়!' এই চিন্তা করিয়া মহাদেব পার্ব্বতী-রূপী দৈত্যের বাঁ-পাশে

চাহিলেন। পার্ব্বতীর বাঁ-পাশে পদ্মচিহ্ন ছিল, কিন্তু দেখিলেন—এ পার্ব্বতীর সে চিহ্ন নাই। তখন ছদ্মবেশী দানবের মায়া বুঝিতে পারিয়া তিনি ভীষণ বজ্রাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিলেন।

মহাদেব স্ত্রীবেশী দানবকে মারিলে পর, সমস্ত ঘটনা না জানাইয়া পবনদেব দূত পাঠাইয়া এই সংবাদ পার্ব্বতীকে জানাইলেন। শুনিয়া দেবীর রাগ হইবার ত কথাই, আর দুঃখও হইল যথেষ্ট। তিনি বীরককে শাপ দিলেন—"তুমি পৃথিবীতে গিয়া, রুক্ষা বৃদ্ধা ও পাথরের মত কঠিন—এমন মায়ের পুত্র হও।"

তারপর ব্রহ্মার বরে গৌরবর্ণা হইয়া পার্ব্বতী যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন বীরক তাঁহাকে হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া, পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কে তুমি? শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও, নতুবা তোমাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিব। পার্ব্বতীর রূপ ধরিয়া এক দুষ্ট দানব ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, মহাদেব জানিতে পারিয়া তাহাকে বধ করিয়াছেন। তারপর অত্যন্ত রাগিয়া আমাকে বলিয়াছেন—'পাহারায় তোমার মনোযোগ নাই, যে ইচ্ছা সে ভিতরে চলিয়া আসে। সাবধান! এরূপ

করিলে দরজায় থাকিতে দিব না।' মহাদেবের এই কথায় আমি সাবধান হইয়াছি। অতএব তোমাকে এখানে প্রবেশ করিতে দিব না, শীঘ্র চলিয়া যাও। আমার মা পার্ব্বতীই শুধু এখানে প্রবেশ করিতে পারেন, অন্যের অধিকার নাই।"

ইহা শুনিয়া দেবীর যা দুঃখ! তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বায়ু তাঁহাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছেন এবং তিনি মিছামিছি বীরককে শাপ দিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বীরককে বলিলেন—"বাছা বীরক! আমার গৌরবর্ণ দেখিয়া আমাকে চিনিতে পারিতেছ না—আমি যে সত্যই তোমার মা পার্ব্বতী। ব্রহ্মার বরে গৌরবর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আর 'মহাদেবের মন্দিরে বাহিরের স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়াছে' এই ভুল সংবাদ পাইয়াই তোমাকে শাপ দিয়াছি! যাহা হউক, তোমার সে পাপ বেশী দিন থাকিবে না।"

তখন দেবীকে চিনিতে পারিয়া বীরকের আনন্দের সীমা রহিল না। সে দেবীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিল।

পতিব্রতার কাহিনী

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

পূর্ব্বকালে প্রতিষ্ঠান-নগরে, এক ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগে একেবারে আতুর হইয়া পড়েন। সাধ্বী ব্রাহ্মণী প্রতিদিন পরম যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহাকে স্নান করান, আহার করান—কোন কাজেই তিনি অবহেলা করিতেন না। ব্রাহ্মণটি ছিলেন অত্যন্ত রাগী এবং উগ্রস্বভাব, সেজন্য এত যত্ন করা সত্ত্বেও স্ত্রীকে তিনি সর্ব্বদা কেবলই তিরস্কার করিতেন। কিন্তু তবু ব্রাহ্মণী একদিনের জন্যও তাঁহার সেবার কোন ক্রুটি করিতেন না।

ব্রাহ্মণের চলিবার ক্ষমতা ছিল না, তবু একদিন স্ত্রীকে বলিলেন—"রাজপথের পাশে সেই যে আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে, আমাকে এখনই সেখানে কাঁধে করিয়া লইয়া চল। বন্ধুকে দেখিবার জন্য আমার মন অস্থির হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণী করিলেন কি, কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, সেই রাত্রেই স্বামীকে কাঁধে করিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন।

একে রাত্রিকাল, তাহাতে আবার আকাশে ঘন মেঘ করিয়া চারিদিক্ গভীর অন্ধকারে ঢাকা। বিদ্যুতের আলোকে পথ দেখিয়া অতি কষ্টে ব্রাহ্মণী চলিয়াছেন।

পথের ধারেই মাণ্ডব্য নামে এক মুনিকে চোর সন্দেহ করিয়া শূলে দেওয়া হইয়াছিল। বিনাদোষে শূল-বিদ্ধ হইয়া মুনি বড়ই যাতনা পাইতেছিলেন। অন্ধকারে চলিতে চলিতে হঠাৎ ব্রাহ্মণীর স্কন্ধস্থিত স্বামীর পায়ের ধাক্কা মাণ্ডব্য মুনির শরীরে লাগিয়া গিয়া, মুনির যন্ত্রণা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তখন মুনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন—"যাহার ধাক্কা লাগিয়া আমার যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল, সেই পাপাত্মা প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইবামাত্রই প্রাণত্যাগ করিবে।

কি সর্ব্বনাশ! হঠাৎ এই নিদারুণ শাপ শুনিয়া ব্রাহ্মণীর মনে কষ্টের সীমা রহিল না। তখন তিনিও বলিলেন—"কি! তুমি মিছামিছি আমার স্বামীকে শাপ দিলে? আমিও বলিতেছি—তাহা হইলে সূর্য্য আর কখনও উদিত হইবেন না।"

পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর কথাই ঠিক হইল, পরদিন আর সূর্য্যোদয় হইল না। তখন হইতে কেবলই রাত্রি, কেবলই

রাত্রি—আলোকের মুখ আর দেখা যায় না। যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি সব বন্ধ হইয়া গেল।

এইরূপে কিছুদিন চলিল। তখন দেবতারা বড় ভয় পাইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—'কি সর্ব্বনাশ! জগতের কাজ চলিবে কি করিয়া? কেবলই রাত্রি! মাস, ঋতু, কিছুই যে ঠিক করা যাইবে না। সূর্য্যোদয় বন্ধ হইল—এখন উপায় কি? সৃষ্টিটাই যে নষ্ট হইয়া যাইবে!'

এইরূপ অনেক চিন্তার পর ব্রহ্মা বলিলেন—"দেবগণ! পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর পুণ্যবলে সূর্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তোমরা গিয়া অত্রিমুনির পত্নী পতিব্রতা তপস্বিনী অনসূয়াকে সন্তুষ্ট কর। তাহা হইলে তিনি তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

ব্রহ্মার উপদেশে দেবতারা অত্রিপত্নী অনসূয়ার নিকট গিয়া, তাঁহার স্তব করিলে পর, তিনি বলিলেন—"দেবগণ! আপনারা কি চান?"

দেবতারা প্রার্থনা করিলেন—"হে দেবি! পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য উদিত হইতে থাকুন।"

অনসূয়া কহিলেন—"পতিব্রতার মহিমা কখনই খর্ব্ব হইবার নহে। যাহা হইক, আমি সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণীর

নিকট গিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব এবং যাহাতে পুনরায় দিবারাত্রির ব্যবস্থা হয়, আর ব্রাহ্মণীর স্বামীরও মৃত্যু না হয়—তাহার উপায় করিতেছি।”

দেবগণকে বিদায় করিয়া অনসূয়া সেই ব্রাহ্মণীর নিকটে গেলেন। তাঁহাদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর, তাঁহাকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন—“তোমার আশ্চর্য্য স্বামিসেবার কথা শুনিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তাই তোমাকে দেখিব বলিয়া তোমার বাড়ীতে আসিলাম।”

ব্রাহ্মণী অতি আদরের সহিত অনসূয়াকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—“দেবি! আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। আর অনুগ্রহ করিয়া যখন পায়ের ধূলা দিয়াছেন, তখন বলুন—কি করিলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।”

অনসূয়া বলিলেন—“হে সাধ্বি! তোমার কথায় সূর্য্যোদয় বন্ধ হইয়া পৃথিবীতে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। সেজন্য দেবতারা দুঃখিতচিত্তে দেবরাজের সহিত আমার নিকটে গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দিবারাত্রির ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। আমিও সেজন্যই তোমার নিকট

আসিয়াছি। এই বিপদ্ হইতে যদি জগৎকে রক্ষা করিতে তোমার ইচ্ছা হয় তবে প্রসন্ন হও এবং সূর্য্যদেবও পূর্ব্বের ন্যায় উদিত হইতে থাকুন।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"দেবী! মাণ্ডব্য মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার স্বামীকে শাপ দিয়াছেন—সূর্য্যোদয় হইলেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। সেজন্য আমিও বলিয়াছি—সূর্য্য আর উদিত হইবেন না।"

অনসূয়া বলিলেন—"পতিব্রতার মহিমাকে আমি প্রণাম করি। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তোমার স্বামীকে আমি পুনরায় জীবিত করিব এবং তিনি পূর্ব্বের ন্যায় রোগমুক্ত সুন্দর শরীর পাইবেন।"

ব্রাহ্মণী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তাহা যদি হয়, তবে আমার আপত্তি কি? আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!"

অনসূয়া সূর্য্যের পূজা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তখন ক্রমাগত দশদিন রাত্রির পর, অনসূয়ার আহ্বানমাত্র পূর্ব্বদিক্ লালবর্ণে আলোকিত করিয়া, সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। অমনি ব্রাহ্মণের প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তাঁহার শরীর মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণী তাহা ধরিয়া ফেলিলেন।

তখন অনসূয়া বলিলেন—"ভদ্রে ! তুমি ভাবিও না; আমি কেবলমাত্র পতিসেবার দ্বারা যে তপোবল লাভ করিয়াছি, এক্ষণে তাহার প্রভাব দেখিতে পাইবে।"

এই বলিয়া অনসূয়া করযোড়ে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"আমি অক্লান্ত পতিসেবা দ্বারা যদি পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যবলে এই ব্রাহ্মণের রোগ দূর হউক, তিনি সুন্দর হউন এবং পুনর্জ্জীবিত হইয়া ব্রাহ্মণীর সহিত একশত বৎসর সুখে বাস করুন।"

অনসূয়ার প্রার্থনামাত্র, ব্রাহ্মণ রোগমুক্ত হইয়া সুন্দর দেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেহপ্রভায় চারিদিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

পণ্ডিতপক্ষীর উপাখ্যান

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

একদিন জৈমিনি মুনি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকটে গিয়া তাঁহাকে নানা বিষয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন করিলেন।

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন—"এখন আমার সন্ধ্যাপূজার সময় হইয়াছে, এতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। তুমি এক কাজ কর—বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুহার মধ্যে চারিটি পক্ষী থাকে, তাহারা দ্রোণ নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র। সেই চারিটি পক্ষী সকল শাস্ত্রে ভারি পণ্ডিত। সেখানে গিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই, তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর পাইবে।"

এই কথা শুনিয়া জৈমিনি অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু! পাখী শাস্ত্র শিখিয়াছে, মানুষের মত কথা বলে, আবার ব্রাহ্মণের পুত্র! এসব কথা বড় আশ্চর্য্য মনে হইতেছে—অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কিরূপে এমন হইল।"

তখন মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন—"পূর্ব্বকালে একদিন

দেবরাজ ইন্দ্র নন্দনকাননে বসিয়া অপ্সরাদিগের গান শুনিতেছিলেন, এমন সময় মহর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত। ইন্দ্র তাঁহাকে খুব আদর-যত্ন করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন; তারপর বলিলেন—'ঠাকুর! এখানে ঊর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা প্রভৃতি বড় বড় অপ্সরা উপস্থিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে যাহার গান শুনিতে আপনার ইচ্ছা হয় বলুন, সে গান গাহিয়া শুনাইবে।'

নারদ অপ্সরাদিগকে বলিলেন—'তোমাদের মধ্যে যে সকলের চাইতে গুণবতী, সে গান কর।'

নারদের কথায় অপ্সরাগণের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হইল। সকলেই বলে, 'আমি যেমন গুণবতী তোমরা তেমন নও।' কিছুতেই আর মীমাংসা হয় না।

তখন ইন্দ্র বলিলেন—'আচ্ছা, তোমরা মুনিঠাকুরকেই জিজ্ঞাসা কর; তিনি যাহাকে গুণবতী বলিবেন সে-ই গান করিবে।'

অপ্সরাগণ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ বলিলেন—'দুর্ব্বাসা মুনি হিমালয়পর্ব্বতের উপর তপস্যা করিতেছেন; যে তাঁহাকে গান শুনাইয়া তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহাকেই যথার্থ গুণবতী বলিব!'

দুর্ব্বাসা মুনির নাম শুনিয়াই সকলে মাথা নাড়িয়া বলিল—'আমাদের কর্ম্ম নহে!' দুর্ব্বাসা মুনি যে রাগী, তাঁহার তপস্যার সময়ে গান গাহিয়া বাধা দিতে কেহই সাহস করিল না।

তখন বপু নামে এক অপ্সরা বলিল—'আজ্ঞা করুন; আমি গিয়া এখনই মুনিঠাকুরকে গান শুনাইয়া আসিতেছি।'

ইহার পর বপু হিমালয়পর্ব্বতে গেল। দুর্ব্বাসা মুনি যেখানে তপস্যা করিতেছিলেন, সেখান হইতে এক ক্রোশ দূরে থাকিয়া সে এমনই মিষ্ট গান করিতে লাগিল যে, দুর্ব্বাসা আপনা হইতেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বপুকে দেখিয়া মুনিঠাকুরের ক্রোধের সীমা রহিল না; তৎক্ষণাৎ তাহাকে শাপ দিলেন—'আমার তপস্যায় বাধা দিতে আসিয়াছিস্—এত বড় স্পর্দ্ধা! ষোল বৎসর তুই পক্ষী হইয়া থাকিবি! তোর চারিটি পুত্র হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে তুই দেখিতে পাইবি না এবং অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হইলেই তুই পুনরায় অপ্সরা হইয়া স্বর্গে যাইবি। যা! তোর আর কোন কথা

শুনিতে চাই না।' এই বলিয়া শাপ দিয়া, দুর্ব্বাসা পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

পক্ষীর রাজা গরুড়ের পুত্র সম্পাতি। সম্পাতির পুত্র সুপার্শ্ব; তাহার পুত্র কুম্ভি। কুম্ভির পুত্র প্রলোলুপের দুই পুত্র—কঙ্ক ও কন্ধর।

কঙ্ক একদিন কৈলাস পর্ব্বতে বেড়াইতে গিয়া এক স্থানে দেখিল—কুবেরের অনুচর বিদ্যুদ্রূপ রাক্ষস স্ত্রীর সহিত বসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে। কঙ্ককে দেখিয়াই রাক্ষস রাগে জ্বলিয়া উঠিল—'কি' তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি এখানে আছি জানিয়াও তুই কোন্ সাহসে এখানে আসিলি?'

কঙ্ক বলিল—'হিমালয়পর্ব্বতে সকলেরই আসিবার অধিকার আছে, তুমি মিছামিছি রাগ করিলে চলিবে কেন?' এই কথা বলা মাত্র, দুষ্ট রাক্ষস খড়্গ দিয়া চক্ষের নিমেষে বেচারী কঙ্কের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

কঙ্কের মৃত্যুর কথা শুনিয়া, তাহার ছোট ভাই কন্ধর ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, কৈলাসপর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত। দূর হইতে দেখিল, বিদ্যুদ্রূপ পাহাড়ে বসিয়া আছে। পূর্ব্বে যেমন ইন্দ্রের সহিত গরুড়ের যুদ্ধ হইয়াছিল,

তেমনই এই রাক্ষসের সহিত কন্ধরের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষস রাগিয়া যেই হাতের খড়্গখানি কন্ধরকে ছুড়িয়া মারিয়াছে, অমনি কন্ধরও খড়্গটাকে ঠোঁটে ধরিয়া চক্ষের নিমেষে দুই ভাগ করিয়া ফেলিল। তারপর দুষ্ট রাক্ষসকে আর বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না। কন্ধর তাহার বুকে দারুণ এক ঠোকর মারিয়া, ঠোঁট ও নখরের আঘাতে তাহার হাত-পা ছিঁড়িয়া অবশেষে তাহার মাথাটি পর্য্যন্ত ছিঁড়িতে বাকি রাখিল না।

রাক্ষস মরিলে পর তাহার স্ত্রী মদনিকা নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—'খগরাজ! আমি মেনকার কন্যা, তুমি আমাকে বিবাহ কর।' এই বলিয়া সে নিজের দেহ ত্যাগ করিয়া, সুন্দর পক্ষিণীর রূপ ধরিল। তখন কন্ধর তাহাকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে তাহার সহিত বাস করিতে লাগিল।

ক্রমে এই পক্ষিণীর কন্যা হইয়া, দুর্ব্বাসা মুনির শাপ-গ্রস্ত অপ্সরা বপু জন্মগ্রহণ করিল। খগরাজ কন্ধর তাহার নাম রাখিল তার্ক্ষী।

মনুপাল নামে এক ব্রাহ্মণের চারিটি পুত্র ছিল, তাহার মধ্যে সকলের ছোটটির নাম ছিল দ্রোণ। দ্রোণ

বড় ধার্ম্মিক ছিলেন, সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। সাধু দ্রোণ কন্ধরের মত লইয়া সুন্দরী তার্ক্ষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই দারুণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তার্ক্ষী একদিন পক্ষীর রূপ ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গেল। গিয়া দেখিল, অর্জ্জুন ও ভগদত্তে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে। এই সময় হঠাৎ অর্জ্জুনের একটা বাণ ছুটিয়া আসিয়া তার্ক্ষীকে আঘাত করিতেই সে মরিয়া গেল; মরিবার সময় শূন্যেই চারিটি সাদা ধব্‌ধবে ডিম পাড়িয়া গেল।

ডিমগুলি মাটিতে পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুনের বাণে ভগদত্তের হাতীর গলার ঘণ্টাটির দড়ি কাটিয়া যাওয়ায়, ঘণ্টাটি ঠিক ডিমগুলির উপরেই পড়িয়া, বেশ একটি আশ্রয়ের মত হইল। এদিকে দুর্ব্বাসা মুনির কথামত তার্ক্ষীও পক্ষিদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় অপ্সরা হইয়া স্বর্গে গেল।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হইলে, একদিন শমীক মুনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। হঠাৎ পক্ষীর ছানার মত চিঁচিঁ শব্দ তাঁহার কানে গেল। তখন শিষ্যদের সহিত অনেক সন্ধান করিয়া, সেই ঘণ্টাটি তুলিয়া দেখিলেন—

তাহার নীচে সুন্দর চারিটি পক্ষিশাবক রহিয়াছে। এই নিরাশ্রয় ছানাগুলিকে দেখিয়া মুনিঠাকুরের দয়া হইল। তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন—'ছানাগুলিকে যত্নের সহিত আশ্রমে লইয়া যাও।'

মহর্ষি শনীকের যত্নে ক্রমে ছানাগুলি বড় হইয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। মুনিঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া ক্রমে তাহাদের জ্ঞানও হইল বেশ।

একদিন শনীক শিষ্যদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় চারিটি পক্ষী আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—'ঠাকুর! আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে মরণ হইতে বাঁচাইয়াছেন—আপনিই আমাদিগের পিতা। এখন আমরা বড় হইয়াছি, আমাদের বুদ্ধি হইয়াছে; এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে বলুন।'

পাখীগুলির বুদ্ধি দেখিয়া এবং তাহারা ঠিক মানুষের মত পরিষ্কার কথা বলিতেছে দেখিয়া, মহর্ষি শনীক বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'তোমরা নিশ্চয়ই কাহারও শাপে পাখী হইয়া জন্মিয়াছ। কেন পাখী হইলে, কে শাপ দিলেন—সব কথা খুলিয়া বল।'

পক্ষীরা বলিল—'পূর্ব্বকালে বিপুলস্বান নামে এক

মুনি ছিলেন, তাঁহার সুকৃষ ও তুম্বুরু নামে দুই পুত্র ছিল। আমরা চারিজন সেই সাধু সুকৃষের সন্তান। আমরা পিতার সঙ্গে বনে আশ্রমে থাকিতাম। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র প্রকাণ্ড এক বৃদ্ধ পক্ষীর রূপ ধরিয়া, আমাদের আশ্রমে আসিয়া পিতাকে বলিলেন—'ঠাকুর! আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে কিছু খাইতে দিন্। আমি বিন্ধ্যপর্ব্বতের চূড়ায় বসিয়াছিলাম, এমন সময় হঠাৎ পক্ষিরাজ গরুড়ের পাখার ঝাপ্‌টা লাগিয়া আমি অজ্ঞান অবস্থায় এখানে পড়িয়া যাই। সাতদিন পরে আজ আমার চৈতন্য হইয়াছে এবং বড় ক্ষুধা পাইয়াছে—অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র কিছু খাইতে দিন্।'

এ কথায় পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি খাইতে চাও বল, তাহাই দিব।'

পাখী বলিল—'মানুষের মাংস খাইলে আমার বড় তৃপ্তি হইবে।'

পিতা বলিলেন—'কি দুঃখের কথা! তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তবু তোমার নিষ্ঠুরতা গেল না? যাহা হউক, যাহা চাহিবে তাহাই দিব বলিয়া যখন কথা দিয়াছি, তখন মানুষের মাংস তোমাকে খাইতে দিব।'

এই বলিয়া পিতা আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—'হে পুত্রগণ! তোমরা যদি আমাকে গুরু এবং পূজনীয় বলিয়া মনে কর, তবে আমি যাহা বলিতেছি তাহা কর। এই পক্ষী ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমার শরণ লইয়াছে; মানুষের মাংস খাইলে নাকি ইহার তৃপ্তি হইবে এবং ক্ষুধা দূর হইবে। অতএব, তোমরা ইহাকে নিজ নিজ শরীরের মাংস খাইতে দাও।'

পিতার এই দারুণ আদেশ শুনিয়া, আমরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম—'কি সর্ব্বনাশ! এ কাজ আমরা কিছুতেই করিতে পারিব না।'

আমাদিগের কথা শুনিয়া পিতা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তখনই শাপ দিলেন—'দুর্ব্বৃত্তগণ! আমি এই পক্ষীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি মানুষের মাংস খাইতে দিব, আর তোমরা আমার কথা রাখিলে না! অতএব, আমার শাপে পাখী হইয়া তোমরা জন্ম লইবে।'

আমাদিগকে এই শাপ দিয়া, তিনি নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিলেন। তারপর পাখীকে বলিলেন—'হে পক্ষি! তুমি আমাকে খাইয়া ক্ষুধা দূর কর।'

পক্ষী বলিল—'ঠাকুর! আগে আপনি যোগবলে

'হে পক্ষি ! তুমি আমাকে খাইয়া ক্ষুধা দূর কর।'

শরীরটাকে ছাড়ুন, তারপর আপনার মাংস খাইব। কারণ, জীবিত মানুষের মাংস আমি কখনও খাই না।'

পক্ষিরূপী ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র পিতা যোগে বসিলেন। তখন ইন্দ্রও নিজের রূপ ধরিয়া বলিলেন—'ঠাকুর! আমি ইন্দ্র। আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি পক্ষীর রূপ ধরিয়া এসব করিয়াছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সত্যরক্ষার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন হইতে আপনি ঐন্দ্রজ্ঞান লাভ করিবেন এবং আপনার তপস্যায় কোন বিঘ্ন ঘটিবে না।' এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র চলিয়া গেলেন।

ইন্দ্র চলিয়া গেলে আমরা পিতার পায়ে পড়িয়া বলিলাম—'শুধু মরণের ভয়ে আমরা আপনার কথা অমান্য করিয়াছি—আমাদিগকে ক্ষমা করুন।'

পিতা বলিলেন—'বাছারা! আমি যাহা বলিয়াছি তাহা হইবেই। তবে তোমরা পাখী হইয়াও খুব জ্ঞানী হইবে। আর আমার আশীর্ব্বাদে তোমরা সৎপথে থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।'—প্রভু! সেই ঘটনার পরেই আমরা পাখী হইয়া জন্ম লইয়াছি। পরে

আপনি দয়া করিয়া, আমাদিগকে আপনার আশ্রমে আনিয়া যত্নের সহিত পালন করিয়াছেন'।"

পক্ষীদিগের এই কাহিনী বর্ণন করিয়া, মার্কণ্ডেয় মুনি পুনরায় বলিলেন—"মহর্ষি শমীকের আদেশে পক্ষিগণ বিন্ধ্যপর্ব্বতে গিয়া, এখন ধর্ম্ম-কর্ম্মে জীবন যাপন করিতেছে। অতএব, হে জৈমিনি! তুমি বিন্ধ্যপর্ব্বতে গিয়া, এই পক্ষিরূপী ব্রাহ্মণপুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেই তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবে।"

জয়-বিজয়ের অভিশাপ

(শিব-পুরাণ)

পুরাকালে একদিন লক্ষ্মী নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমার এমন কোমল শরীর লইয়া কিরূপে তুমি যুদ্ধ কর? আমার দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

বিষ্ণু বলিলেন—"আচ্ছা, তোমাকে আমার যুদ্ধ দেখাইব।"

ইহার পর, একদিন বিষ্ণু বসিয়া ভাবিতেছিলেন—লক্ষ্মীর যুদ্ধ দেখিবার সাধ হইয়াছে, এখন কাহার সহিত যুদ্ধ করা যায়? এমন সময় দারুণ একটা কোলাহল শুনিতে পাইয়া, মন্দিরের দরজায় গিয়া দেখিলেন, এক মহা ব্যাপার উপস্থিত! সনক প্রভৃতি ঋষিকুমারগণ কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার দ্বাররক্ষক জয়-বিজয়কে শাপ দিয়াছেন এবং সেই জন্যই কোলাহল হইতেছে।

তখন সমস্ত বিষয় শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন—"দেখিতেছি উভয় পক্ষেরই অন্যায় কাজ করা হইয়াছে। কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহার আর অন্যথা হইবে না। যাহা হউক, হে ঋষিকুমারগণ! আপনারা জয়-বিজয়কে দয়া করুন।"

বিষ্ণুর অনুরোধে কুমারগণ জয়-বিজয়কে বলিলেন—"তোমরা যদি বিষ্ণুভক্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মিতে চাও, তাহা হইলে সাত জন্মের পর, আর যদি বিষ্ণুর শত্রুরূপে জন্মগ্রহণ কর, তবে বিষ্ণুর হাতে মরিয়া তিন জন্মের পর, তোমাদিগের শাপ দূর হইবে।"

ইহা শুনিয়া জয়-বিজয় ভাবিল—শত্রুভাবে জন্মিলে বিষ্ণুর অস্ত্রে শীঘ্রই মুক্তি পাইব, অতএব ইহাই ভাল। এই ভাবিয়া বলিল—"আমরা শত্রুরূপেই জন্মিতে চাই।"

তাহাই হইল। জয়-বিজয় এই কথা বলিবামাত্র, মাটিতে পড়িয়া গেল! তারপর তাহারা হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে মহাপরাক্রান্ত দুই অসুর হইয়া জন্মিল। তখন তাহাদের পিতা ছিলেন মহামুনি কশ্যপ। এই জন্মে বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করেন। সনকাদি ঋষিকুমারগণ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ প্রভৃতি অসুর হইয়া জন্মিয়াছেন।

নৃসিংহদেব কিরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই শুনিয়াছ। হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াও নৃসিংহদেবের তেজ শান্ত হইল না। সেই তেজে পৃথিবী ছারখার হইবার উপক্রম হইল, দেবতারা প্রমাদ গণিলেন।

এখন, কে নৃসিংহদেবের নিকটে গিয়া, তাঁহাকে তেজ

শান্ত করিতে অনুরোধ করিবে? দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ করিলে পর, তিনি ভয় পাইয়া বলিলেন —"যে ভীষণ তেজ, আমি নিকটে যাইতে ভরসা পাই না। শেষে কি চক্ষু হারাইয়া অন্ধ হইব?"

ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন—"না বাবা! আমার দাড়ি পুড়িয়া যাইবে, আমি যাইতে পারিব না।"

লক্ষ্মীকে অনুরোধ করিলে তিনিও সম্মত হইলেন না; বলিলেন—"বিষ্ণুর ওরূপ ভীষণ মূর্ত্তি আমি কখনও দেখি নাই—আমার ভয় করিতেছে।"

অবশেষে দেবতাগণ প্রহ্লাদের নিকট গিয়া বলিলেন —"বাপু, তুমি যাও। নৃসিংহদেব তোমাকে বড় ভাল-বাসেন, তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।"

বাস্তবিক তাহাই হইল। প্রহ্লাদ নিকটে যাইবামাত্র নৃসিংহ জিহ্বা দিয়া তাহার গা চাটিতে লাগিলেন, তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বার বার আদর করিতে লাগিলেন; তারপর তাহাকে বলিলেন—"এখন তুমি সুখে রাজ্য পালন কর। আমি বর দিতেছি, তোমার বংশে কেহ আমার হাতে মরিবে না।"

প্রহ্লাদকে এই বলিয়াই নৃসিংহ ভীষণ উল্লাসে মুখ দিয়া ঝড়ের বাতাস বাহির করিতে লাগিলেন।

দেবতারা ভাবিলেন—প্রহ্লাদকে পাঠাইয়া হিতে-বিপরীত হইল! নৃসিংহদেব শান্ত হওয়া দূরে থাকুক, আবার এ কি সাংঘাতিক ফুৎকার আরম্ভ করিলেন! তখন তাঁহারা গণেশকে বলিলেন—"আপনি বুদ্ধিমানের মধ্যে সকলের বড়। হে গণপতি! আপনি গিয়া নৃসিংহকে শান্ত করুন।"

গণেশ সন্তুষ্ট হইয়া, ইঁদুর বাহনটিতে চড়িয়া যাত্রা করিলেন। গণেশের দেহটি প্রকাণ্ড, পেটটি তাঁহার লম্বোদর নামেরই উপযুক্ত—বাহনটি আবার ইঁদুর! তাঁহাকে দেখিয়া দেবগণের বড়ই আমোদ হইল।

যাহা হউক, গণেশ যখন গম্ভীর চালে নৃসিংহদেবের নিকটে গেলেন, ঠিক সেই সময়ে নৃসিংহদেবও ফুৎকার ছাড়িলেন। আর যায় কোথায়! গণেশের বাহন ফুৎকারের চোটে ডিগ্‌বাজী খাইয়া মাটিতে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে গণেশও উল্টিয়া গড়াগড়ি দিয়া উঠিলেন। এই মজার দৃশ্যটি দেখিয়া, শুধু দেবতারা নহেন, স্বয়ং নৃসিংহদেবও হাসিয়া অস্থির!

নৃসিংহদেব হাসিয়া অস্থির !

নৃসিংহদেবের হাসি দেখিয়া দেবতারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার রাগ দূর হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার তেজ তবুও দূর হইল না দেখিয়া নিরুপায় দেবতাগণ মহাদেবের শরণ লইলেন। মহাদেব তখন অদ্ভুত 'শরভ' রূপ ধারণ করিয়া নৃসিংহদেবকে শান্ত করেন।

জয়-বিজয় দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ হইল। সেই জন্মে বিষ্ণু হইলেন রাম এবং সনকাদি ঋষিরা বিভীষণ, হনুমান প্রভৃতি রূপে জন্মিয়া রামের সেবক হইয়াছিলেন।

রাবণের মৃত্যুর পর জয়-বিজয় তৃতীয় জন্মে দমঘোষের ঘরে শিশুপাল ও দন্তবক্র হইয়া জন্মিল। বিষ্ণু জন্মিলেন কৃষ্ণ হইয়া এবং ঋষিকুমারগণও অক্রুর প্রভৃতি হইয়া জন্মিয়াছিলেন।

শিশুপাল ও দন্তবক্র কৃষ্ণের ভয়ানক শত্রু ছিল। কৃষ্ণের হাতে তাহাদের মৃত্যু হইলে ঋষির শাপ দূর হইল,—জয়-বিজয় পুনরায় বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর দ্বাররক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। লক্ষ্মীরও নারায়ণের যুদ্ধ দেখিবার সাধ মিটিল।